To the halaqa speakers: এই ডকুমেন্টে আমরা প্রত্যেক আয়াতের জন্য ৩টা তাফসীর থেকে ব্যাখ্যা সংযোজন করেছি। যাতে সহজেই একটি আয়াতের বিভিন্ন তাফসীরের ব্যাখ্যা এক জায়গা থেকে পড়া যায়। যাকে যে আয়াত এসাইন করা হয়, সেই আয়াত সমূহের ৩ তাফসীরের একটা সামারি করার অনুরোধ রইল। অবশ্যই আপনি এই তিন তাফসীরের বাইরে অন্য তাফসীরের রেফারেন্সও নিয়ে আসতে পারেন। হালাকার পক্ষ থেকে সব তাফসীর এক সাথে সংকলন করে দেয়া কষ্টসাধ্য।

To Everyone else: বাকি সবাই সম্পূর্ণ তাফসীর অন্তত একবার পড়ার চেষ্টা করি। প্রতিদিন ১-২ আয়াত করে পড়লে সম্পূর্ণ তাফসীর কয়েক দিনে শেষ করা সম্ভব হবে। সেই সাথে হালাকার শেষ অংশে : open discussion, Q&A এ অংশগ্রহণ করতে পারি।

আল মুমিনূন **(1--11)**

Step 1: সহীহ তেলাওয়াত:

(قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ)

(الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ)

(وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ)

(وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ)

(وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ)

(إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ)

(فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ)

(وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ)

(وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ)

(أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ)

(الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ)

Step 2: সরল অনুবাদ:

1. নিশ্চিতভাবে সফলকাম হয়েছে মু'মিনরা (Successful indeed are the believers).
2. যারাঃ নিজেদের নামাযে বিনয়াবনত হয় (those who humble themselves in prayer;)
3. বাজে কাজ থেকে দূরে থাকে । / (যারা অসার ক্রিয়াকলাপ কথাবার্তা হতে বিরত থাকে) (those who avoid idle talk;) ।
4. যাকাতের পথে সক্রিয় থাকে । / (যারা রীতিমত যাকাত প্রদান করে।) (those who pay alms-tax) ।
5. নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে (those who guard their chastity) ।
6. নিজেদের স্ত্রীদের ও অধিকারভুক্ত বাঁদীদের ছাড়া, এদের কাছে (হেফাজত না করলে) তারা তিরষ্কৃত হবে না, (Except from their wives or those their right hands possess,1 for indeed, they will not be blamed) ।
7. তবে যারা এর বাইরে আরো কিছু চাইবে তারাই হবে সীমালংঘনকারী, (but whoever seeks beyond that are the transgressors;) ।
8. নিজেদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে (And they who are to their trusts and their promises attentive) ।
9. এবং নিজেদের নামাযগুলো রক্ষণাবেক্ষণ করে। / (যারা নিজেদের নামায সমূহের ব্যাপারে যত্নবান হয়।) (and those who are ˹properly˺ observant of their prayers.) ।
10. তারাই এমন ধরনের উত্তরাধিকারী যারা নিজেদের উত্তরাধিকার হিসেবে ফিরদাউস লাভ করবে (Those are the inheritors) ।
11. এবং সেখানে তারা থাকবে চিরকাল । (Paradise as their own. They will be there forever.)

Step 3: নামকরণ**:** প্রথম আয়াত থেকে সূরার নাম গৃহীত হয়েছে । সূরাটির এই বিশেষ নামই এর মধ্যে কি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে তার দিকে ইঙ্গিত করছে।

Step 4: নাযিলের সময়-কাল: বর্ণনাভংগী ও বিষয়বস্তু উভয়টি থেকে জানা যায়, এ সূরাটি মক্কী যুগের মাঝমাঝি সময় নাযিল হয় । প্রেক্ষাপটে পরিষ্কার অনুভব করা যায় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লাম ও কাফেরদের মধ্যে ভীষণ সংঘাত চলছে । কিন্তু তখনো কাফেরদের নির্যাতন নিপীড়ন চরমে পৌঁছে যায়নি । ৭৫-৭৬ আয়াত থেকে পরিষ্কার সাক্ষ পাওয়া যায় যে, মক্কী যুগের মধ্যভাগে আরবে যে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল বলে নির্ভরযোগ্য বর্ণনা থেকে জানা যায় ঠিক সে সময়ই এ সূরাটি নাযিল হয় । উরওয়াহ ইবনে যুবাইরের একটি বর্ণনা থেকে জানা যায়, এ সূরা নাযিল হওয়ার আগেই হযরত উমর (রা) ইসলাম গ্রহন করেছিলেন । তিনি আবদুর রহমান ইবনে আবদুল কারীর বরাত দিয়ে হযরত উমরের (রা) এ উক্তি উদ্বৃত করেছেন যে, এ সূরাটি তাঁর সামনে নাযিল হয় । অহী নাযিলের সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবস্থা কি রকম হয় তা তিনি স্বচক্ষেই দেখেছিলেন এবং এ অবস্থা অতিবাহিত হবার পর নবী (সা)

বলেন, এ সময় আমার ওপর এমন দশটি আয়াত নাযিল হয়েছে যে, যদি কেউ সে মানদন্ডে পুরোপুরি উতরে যায় তাহলে সে নিশ্চিত জান্নাতে প্রবেশ করবে। তারপর তিনি এ সূরার প্রাথমিক আয়াতগুলো শোনান।

Step 5: সূরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু/ আলোচ্য বিষয়:

তাফহীম: "নিশ্চিতভাবেই সফলতা লাভ করেছে"। এ শব্দগুলো দিয়ে বাক্য শুরু করার গুঢ় তাৎপর্য বুঝতে হলে যে পরিবেশে এ ভাষণ দেয়া হচ্ছিল তা চোখের সামনে রাখা অপরিহার্য। তখন একদিকে ছিল ইসলামী দাওয়াত বিরোধী সরদারবৃন্দ। তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য উন্নতির পর্যায়ে ছিল। তাদের কাছে ছিল প্রচুর ধন-দওলত। বৈষয়িক সমৃদ্ধির যাবতীয় উপাদান তাদের হাতের মুঠোয় ছিল। আর অন্যদিকে ছিল ইসলামী দাওয়াতের অনুসারীরা। তাদের অধিকাংশ তো আগে থেকেই ছিল গরীব ও দুর্দশাগ্রস্ত। কয়েকজনের অবস্থা সচ্ছল থাকলেও অথবা কাজ - কারবারের ক্ষেত্রে তারা আগে থেকেই সফলকাম থাকলেও সর্বব্যাপী বিরোধীতার কারণে তাদের অবস্থাও এখন খারাপ হয়ে গিয়েছিলো। এ অবস্থায় যখন "নিশ্চিতভাবেই মু'মিনরা সফলকাম হয়েছে" বাক্যাংশ দিয়ে বক্তব্য শুরু করা হয়েছে তখন এ থেকে আপনা আপনি এ অর্থ বের হয়ে এসেছে যে, তোমাদের সাফল্য ও ক্ষতির মানদন্ড ভুল, তোমাদের অনুমান ত্রুটিপূর্ণ, তোমাদের দৃষ্টি দূরপ্রসারী নয়, তোমাদের নিজেদের যে সাময়িক ও সীমিত সমৃদ্ধিকে সাফল্য মনে করছো তা আসল সাফল্য নয়, তা হচ্ছে ক্ষতি এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে অনুসারীদেরকে তোমরা ব্যর্থ ও অসফল মনে করছো তারাই আসলে সফলকাম ও সার্থক। এ সত্যের দাওয়াত গ্রহণ করে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি বরং তারা এমন জিনিস লাভ করেছে যা তাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জায়গায় স্থায়ী সমৃদ্ধি দান করবে। আর ওকে প্রত্যাখান করে তোমরা আসলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর খারাপ পরিণতি তোমরা এখানেও দেখবে এবং দুনিয়ার জীবনকাল শেষ করে পরবর্তী জীবনেও দেখতে থাকবে।

এ হচ্ছে এ সূরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু। এ সূরার সমগ্র ভাষণ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এ বক্তব্যটিকে মনের মধ্যে বদ্ধমূল করে দেবার জন্য উপস্থাপন করা হয়েছে।

ফি যিলালিল কুরআন: সুরাটিকে প্রধানত ৪ টি অংশ ভাগ করে ঈমানদারদের ৪ টি অবস্থার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

প্রথম পর্যায়ে মুমিনদের কৃতকার্য হওয়ার জরুরি শর্তাবলী উল্লেখ করতে গিয়ে বলা হয়েছে :

"অবশ্যই মুমিনরা কৃতকার্য হবে" ....

এ কথা ঘোষণা দেয়ার পর তাদের যে সব গুণাবলী থাকা দরকার সেগুলো উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে এসব গুন্ থাকলে অবশ্যই তারা কৃতকার্য হবে। তাদের জন্য কৃতকার্য হওয়া বাধ্যতামূলক করে দেয়া হয়েছে। একথাগুলো বলতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, মানুষের নিজেদের মধ্যে এবং গোটা পরিবেশে ঈমানের এসব প্রমান থাকতে হবে।

Step 6: শাব্দিক অর্থ ও ব্যাখ্যা:

Verse 1:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ)

নিশ্চিতভাবে সফলকাম হয়েছে মু'মিনরা [A] (Successful indeed are the believers).

قَدْ শব্দটা **تَحْقِيق** তথা দৃঢ়তা সূচক।

فَلَاحُ থেকে أَفْلَحَ শব্দটি এসেছে। যার অর্থ সফল হওয়া এবং অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয় থেকে রক্ষা পাওয়া। ফালাহ মানে সাফল্য ও সমৃদ্ধি । এটি ক্ষতি, ঘাটতি , লোকসান ও ব্যর্থতার বিপরীত অর্থবোধক শব্দ।

তাফহীম:

A.

الْمُؤْمِنُونَ মু'মিনরা বলতে এমন লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াত গ্রহণ করেছে, তাঁকে নিজেদের নেতা ও পথপ্রদর্শক বলে মেনে নিয়েছে এবং তিনি জীবন যাপনের যে পদ্ধতি পেশ করেছেন তা অনুসরণ করে চলতে রাজি হয়েছে ।

"নিশ্চিতভাবেই সফলতা লাভ করেছে"। এ শব্দগুলো দিয়ে বাক্য শুরু করার গুঢ় তাৎপর্য বুঝতে হলে যে পরিবেশে এ ভাষণ দেয়া হচ্ছিল তা চোখের সামনে রাখা অপরিহার্য । তখন একদিকে ছিল ইসলামী দাওয়াত বিরোধী সরদারবৃন্দ । তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য উন্নতির পর্যায়ে ছিল। তাদের কাছে ছিল প্রচুর ধন-দওলত । বৈষয়িক সমৃদ্ধির যাবতীয় উপাদান তাদের হাতের মুঠোয় ছিল । আর অন্যদিকে ছিল ইসলামী দাওয়াতের অনুসারীরা । তাদের অধিকাংশ তো আগে থেকেই ছিল গরীব ও দুর্দশাগ্রস্ত । কয়েকজনের অবস্থা সচ্ছল থাকলেও অথবা কাজ - কারবারের ক্ষেত্রে তারা আগে থেকেই সফলকাম থাকলেও সর্বব্যাপী বিরোধীতার কারণে তাদের অবস্থাও এখন খারাপ হয়ে গিয়েছিলো। এ অবস্থায় যখন "নিশ্চিতভাবেই মু'মিনরা সফলকাম হয়েছে" বাক্যাংশ দিয়ে বক্তব্য শুরু করা হয়েছে তখন এ থেকে আপনা আপনি এ অর্থ বের হয়ে এসেছে যে, তোমাদের সাফল্য ও ক্ষতির মানদন্ড ভুল, তোমাদের অনুমান ত্রুটিপূর্ণ, তোমাদের দৃষ্টি দূরপ্রসারী নয়, তোমাদের নিজেদের যে সাময়িক ও সীমিত সমৃদ্ধিকে সাফল্য মনে করছো তা আসল সাফল্য নয়, তা হচ্ছে ক্ষতি এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে অনুসারীদেরকে তোমরা ব্যর্থ ও অসফল মনে করছো তারাই আসলে সফলকাম ও সার্থক । এ সত্যের দাওয়াত গ্রহণ করে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি বরং তারা এমন জিনিস লাভ করেছে যা তাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জায়গায় স্থায়ী সমৃদ্ধি দান করবে। আর ওকে প্রত্যাখান করে তোমরা আসলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর খারাপ পরিণতি তোমরা এখানেও দেখবে এবং দুনিয়ার জীবনকাল শেষ করে পরবর্তী জীবনেও দেখতে থাকবে।

এ হচ্ছে এ সূরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু । এ সূরার সমগ্র ভাষণ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এ বক্তব্যটিকে মনের মধ্যে বদ্ধমূল করে দেবার জন্য উপস্থাপন করা হয়েছে।

ইবনে কাসীর:

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রসূল (স) বলেন আল্লাহ তায়ালা একটি বড় সাদা মুক্তা, একটি লাল ইয়াকুত, ও একটি সবুজ জাবারজাদের ইট দ্বারা "আদন " নামক বেহেস্ত সৃষ্টি করেন। এর গাঁথুনি হল মিশক, কংকর হলো

মুক্তা, এবং উহার ঘাস হল জাফরান। বেহেস্ত সৃষ্টির পর বলা হলো তুমি কথা বল। সে বলে উঠলো قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ(

Verse 2:

الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ(

যারাঃ নিজেদের [B] নামাযে বিনয়াবনত [C] হয় (those who humble themselves in prayer;)

الخشوع অর্থ অন্তরের একাগ্রতা

তাফহীম:

B. এখান থেকে নিয়ে ৯ আয়াত পর্যন্ত মু'মিনদের যে গুণাবলীর কথা বলা হয়েছে তা আসলে মু'মিনরা সফলকাম হয়েছে এ বক্তব্যের সপক্ষে যুক্তিস্বরূপ । অন্য কথায়, বলা হচ্ছে, যেসব লোক এ ধরনের গুণাবলীর অধিকারী তারা কেনইবা সফল হবেনা । এ গুনাবলী সম্পন্ন লোকেরা ব্যর্থ ও অসফল কেমন করে হতে পারে । তারাই যদি সফলকাম না হয় তাহলে আর কারা সফলকাম হবে।

C. মূল শব্দ হচ্ছে "খুশূ"। এর আসল মানে হচ্ছে করোর সামনে ঝুঁকে পড়া, দমিত বা বশীভূত হওয়া , বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করা। এ অবস্থাটার সম্পর্ক মনের সাথে এবং দেহের বাহ্যিক অবস্থার সাথেও।মনের খূশূ' হচ্ছে, মানুষ কারোর ভীতি, শ্রেষ্ঠত্ব, প্রতাপ ও পরাক্রমের দরুন সন্ত্রস্ত ও আড়ষ্ট থাকবে । আর দেহের খুশূ' হচ্ছে, যখন সে তার সামনে যাবে তখন মাথা নত হয়ে যাবে, অংগ-প্রত্যংগ ঢিলে হয়ে যাবে, দৃষ্টি নত হবে, কন্ঠস্বর নিম্নগামী হবে এবং কোন জবরদস্ত প্রতাপশালী ব্যক্তির সামনে উপস্থিত হলে মানুষের মধ্যে যে স্বাভাবিক ভীতির সঞ্চার হয় তার যাবতীয় চিহ্ন তার মধ্যে ফুটে উঠবে । নামাযে খুশূ' বলতে মন ও শরীরের এ অবস্থাটা বুঝায় এবং এটাই নামাযের আসল প্রাণ । হাদীসে বলা হয়েছে, একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে নামায পড়তে দেখলেন এবং সাথে সাথে এও দেখলেন যে , সে নিজের দাড়ি নিয়ে খেলা করছে । এ অবস্থা দেখে তিনি বললেন, ---------- "যদি তার মনে খুশূ' থাকতো তাহলে তার দেহেও খুশূ'র সঞ্চার হতো"।

যদিও খুশূ'র সম্পর্ক মূলত মনের সাথে এবং মনের খুশূ' আপনা আপনি দেহে সঞ্চারিত হয়, যেমন ওপরে উল্লেখিত হাদিস থেকে এখনই জানা গেলো, তবুও শরীয়াতে নামাযের এমন কিছূ নিয়ম-কানুন নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে যা একদিকে মনের খুশূ' (আন্তরিক বিনয়- নম্রতা) সৃষ্টিতে সাহায্য করে এবং অন্যদিকে খুশূ'র হ্রাস-বৃদ্ধির অবস্থায় নামাযের কর্মকান্ডকে কমপক্ষে বাহ্যিক দিক দিয়ে একটি বিশেষ মানদণ্ডে প্রতিষ্ঠিত রাখে। এই নিয়ম-কানুনগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে, নামাযী যেন ডানে বামে না ফিরে এবং মাথা উঠিয়ে ওপরের দিকে না তাকায়, (বড়জোর শুধুমাত্র চোখের কিনারা দিয়ে এদিক ওদিক তাকাতে পারে। হানাফী ও শাফেয়ীদের মতে দৃষ্টি সিজদার স্থান অতিক্রম না করা উচিত। কিন্তু মালেকীগণ মনে করেন দৃষ্টি সামনের দিকে থাকা উচিত।)

নামাযের মধ্যে নড়াচড়া করা এবং বিভিন্ন দিকে ঝুঁকে পড়া নিষিদ্ধ। বারবার কাপড় গুটানো অথবা ঝাড়া কিংবা কাপড় নিয়ে খেলা করা জায়েয নয়। সিজদায় যাওয়ার সময় বসার জায়গা বা সিজদা করার জায়গা পরিষ্কার করার চেষ্টা করতেও নিষেধ করা হয়েছে। গর্বিত ভংগীতে খাড়া হওয়া, জোরে জোরে ধমকের সুরে কুরআন পড়া অথবা কুরআন পড়ার মধ্যে গান গাওয়াও নামাযের নিয়ম বিরোধী । জোরে জোরে আড়মোড়া ভাংগা ও ঢেকুর তোলাও নামাযের মধ্যে বেআদবী হিসেবে গণ্য। তাড়াহুড়া করে টপাটপ নামায পড়ে নেয়াও ভীষণ অপছন্দনীয়। নির্দেশ হচ্ছে, নামাযের প্রত্যেকটি কাজ পুরোপুরি ধীরস্থিরভাবে শান্ত সমাহিত চিত্তে সম্পন্ন করতে হবে। এক একটি াকাজ যেমন রুকূ', সিজদা, দাঁড়ানো বা বসা যতক্ষণ পুরোপুরি শেষ না হয় ততক্ষণ অন্য কাজ শুরু করা যাবে না। নামায পড়া অবস্থায় যদি কোন জিনিস কষ্ট দিতে থাকে তাহলে এক হাত দিয়ে তা দূর করে দেয়া যেতে পারে। কিন্তু বারবার হাত নাড়া অথবা উভয় হাত একসাথে ব্যবয় হাত এহার করা নিষিদ্ধ।

এ বাহ্যিক আদবের সাথে সাথে নামাযের মধ্যে জেনে বুঝে নামাযের সাথে অসংশ্লিষ্ট ও অবান্তর কথা চিন্তা করা থেকে দূরে থাকার বিষয়টিও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অনিচ্ছাকৃত চিন্তা-ভাবনা মনের মধ্যে আসা ও আসতে থাকা মানুষ মাত্রেরই একটি স্বভাবগত দূর্বলতা। কিন্তু মানুষের পূর্ণপ্রচেষ্টা থাকতে হবে নামাযের সময় তার মন যেন আল্লাহর প্রতি আকৃষ্ট থাকে এবং মুখে সে যা কিছু উচ্চারণ করে মনও যেন তারই আর্জি পেশ করে। এ সময়ের মধ্যে যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে অন্য চিন্তাভাবনা এসে যায় তাহলে যখনই মানুষের মধ্যে এর অনুভূতি সজাগ হবে তখনই তার মনোযোগ সেদিক থেকে সরিয়ে নিয়ে পুনরায় নামাযের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

ইবনে কাসীর:

আলী ইব্ন তালহা (র) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে তাফসীর করেছেন " যারা নিজ অন্তরে আল্লাহর ভয় পোষণ করে ধীরস্থির ও একাগ্রতা সহকারে সালাত আদায় করে " ।

মুহাম্মদ ইবনে সীরীন (র) বলেন, যখন এই আয়াতটি নাজিল হলো তখন থেকে সাহাবাগণ সিজদার স্থানে চক্ষু অবনত রাখিতেন।

সালাতের প্রতি নিবিষ্টতা কেবল তখনই লাভ করা যায়, যখন অন্তর অন্যান্য সকল বিষয় হতে অবসর নিয়ে সালাতের জন্য নিয়োজিত হয়।

ফী যিলালিল কোরআন:

১। 'যারা তাদের নামাযে (ভয় ভরা মন নিয়ে) বিনয়াবনত'.....নামাযে দাঁড়ানো অবস্থায় যখন তারা মহান আল্লাহর সামনে উপস্থিত বলে মনে করে, তখন তাদের হৃদয়ে প্রচন্ড ভয় জাগে, যার লক্ষণ ফুটে উঠে তাদের প্রতিটি অংগ প্রত্যংগে এবং তাদের প্রতিটি নড়া চড়ায়, প্রতিটি মুহূর্তে। মহান আল্লাহর সামনে দন্ডায়মান থাকার চেতনা তাদের আত্মার ওপর পরিব্যাপ্ত থাকে। এর ফলে তাদের মন-মস্তিষ্ক থেকে অন্য সকল চিন্তা চেতনা ও ব্যস্ততা দূর হয়ে যায়। এ সময়ে আল্লাহর চিন্তা চেতনা ছাড়া অন্য কিছু তাকে অস্থির করে না, প্রকৃতপক্ষে, আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে থাকার অনুভূতি তাকে সংগোপনে আল্লাহর কাছে কিছু চাওয়ার জন্যে উদ্বুদ্ধ করে এবং সে তখন মনে মনে মোনাজাত করতে থাকে। এ ধরনের একান্ত সান্নিধ্য লাভের পবিত্র অনুভূতি তাকে আশে-পাশের সব কিছু ভুলিয়ে দেয় এবং তার মনকে অন্য সবার থেকে সরিয়ে নেয়। তখন তারা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায় না, হৃদয়ের গভীরে তাঁকে ছাড়া তারা আর কাউকে অনুভব করে না, এ বিশ্বের অস্তিত্বের সব কিছুই তখন তাদের কাছে অর্থহীন হয়ে যায়, তখন যাবতীয় ক্লেদ থেকে মুক্ত হয়ে তাদের হৃদয়গুলো পবিত্রতায় ভরে যায় এবং তাদের মনমগয পৃথিবীর যাবতীয় সংকীর্ণতা ও আত্মম্ভরিতার আবর্জনা থেকে পরিষ্কার হয়ে ধুয়ে মুছে যায়, এসময় তাদের অন্তরের মধ্যে আল্লাহর অনুভূতি ছাড়া আর কারো কথাই থাকে না..... ফলে মাটির এ দেহের প্রতিটি অণু-পরমাণু তখন যেন মূল উৎসের সাথে সম্মিলিত হয়ে যায় এবং তাদের উদভ্রান্ত-বিভ্রান্ত ও দিশেহারা আত্মাগুলো তাদের বাঞ্ছিত পথ খুঁজে পায়, পৃথিবীর ধূম্রজালে আচ্ছাদিত তাদের অস্থির হৃদয় জীবনের আসল ঠিকানাটির সন্ধান পেয়ে ধন্য ও কৃতার্থ হয়ে যায়, তখন তার কাছে পৃথিবীর বস্তুবাদী মূল্যমান ম্লান হয়ে যায়।

Verse 3:

(وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ

বাজে কাজ থেকে দূরে থাকে,[D] . / যারা অসার ক্রিয়াকলাপ কথাবার্তা হতে বিরত থাকে। and who shun vain talk, and other [nonsense], (Jalalyn)

তাফহীম:

D. মূলে **لغو** শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর মানে এমন প্রত্যেকটি কথা ও কাজ যা অপ্রয়োজনীয়, অর্থহীন ও যাতে কোন ফল লাভও হয় না। যেসব কথায় বা কাজে কোন লাভ হয় না, যেগুলোর পরিণাম কল্যাণকর নয়, যেগুলোর আসলে কোন প্রয়োজন নেই, যেগুলোর উদ্দেশ্যও ভালো নয়- সেগুলোর সবই 'বাজে' কাজের অন্তরভূক্ত।

مُعْرِضُونَ শব্দের অনুবাদ করেছি 'দূরে থাকে'। কিন্তু এতটুকুতে সম্পূর্ণ কথা প্রকাশ হয় না। আয়াতের পূর্ণ বক্তব্য হচ্ছে এই যে, তারা বাজে কথায় কান দেয় না এবং বাজে কাজের দিকে দৃষ্টি ফেরায় না। সে ব্যাপারে কোন প্রকার কৌতুহল প্রকাশ করে না। যেখানে এ ধরনের কথাবার্তা হতে থাকে অথবা এ ধরণের কাজ চলতে

থাকে সেখানে যাওয়া থেকে দূরে থাকে। তাতে অংশগ্রহণ করতে বিরত হয় আর যদি কোথাও তার সাথে মুখোমুখি হয়ে যায় তাহলে তাকে উপেক্ষা করে এড়িয়ে চলে যায় অথবা অন্তত পক্ষে তা থেকে সম্পর্কহীন হয়ে যায়।

সূরা ফুরকানের ৭২ নম্বর আয়াতে ও আল্লাহ বলেছেন :
وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا
"যখন এমন কোন জায়গা দিয়ে তারা চলে যেখানে বাজে কথা হতে থাকে অথবা বাজে কাজের মহড়া চলে তখন তারা ভদ্রভাবে সে জায়গা অতিক্রম করে চলে যায়।"

এ ছোট্ট সংক্ষিপ্ত বাক্যটিতে যে কথা বলা হয়েছে তা আসলে মু'মিনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গুণাবলীর অন্তরভুক্ত। মু'মিন এমন এক ব্যক্তি যার মধ্যে সবসময়ে দায়িত্বানুভূতি সজাগ থাকে সে মনে করে দুনিয়াটা আসলে একটা পরীক্ষাগৃহ। যে জিনিসটিকে জীবন, বয়স, সময় ইত্যাদি বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে সেটি আসলে একটি মাপাজোকা মেয়াদ। তাকে পরীক্ষা করার জন্য এ সময়-কালটি দেয়া হয়েছে। যে ছাত্রটি পরীক্ষার হয়ে বসে নিজের প্রশ্নপত্রের জবাব লিখে চলছে সে যেমন নিজের কাজকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে পূর্ণ ব্যস্ততা সহকারে তার মধ্যে নিজেকে নিমগ্ন করে দেয়। সেই ছাত্রটি যেমন অনুভব করে পরীক্ষার এ ঘন্টা ক'টি তার আগামী জীবনের চূড়ান্ত ভাগ্য নির্ধারণকারী এবং এ অনুভূতির কারণে সে এ ঘন্টাগুলোর প্রতিটি মুহূর্তে নিজের প্রশ্নপত্রের সঠিক জবাব লেখার প্রচেষ্টায় ব্যয় করতে চায় এবং এগুলোর একটি সেকেন্ডে বাজ কাজে নষ্ট করতে চায় না, ঠিক তেমনি মু'মিনও দুনিয়ার এ জীবনকালকে এমন সব কাজে ব্যয় করে যা পরিণামের দিক দিয়ে কল্যাণকর। এমনকি সে খেলাধূলা ও আনন্দ উপভোগের ক্ষেত্রেও এমন সব জিনিস নির্বাচন করে যা নিছক সময় ক্ষেপণের কারণ হয় না বরং কোন অপেক্ষাকৃত ভালো উদ্দেশ্যপূর্ণ করার জন্য তাকে তৈরী করে। তার দৃষ্টিতে সময় 'ক্ষেপণ' করার জিনিস হয় না বরং ব্যবহার করার জিনিস হয় । অন্য কথায়,সময় কাটানোর জিনিস নয়- কাজে 'খাটানোর' জিনিস।

এ ছাড়াও মু'মিন হয় একজন শান্ত-সমাহিত ভারসাম্যপূর্ণ প্রকৃতির অধিকারী এবং পবিত্র-পরিচ্ছন্ন স্বভাব ও সুস্থ রুচিসম্পন্ন মানুষ। বেহুদাপনা তার মেজাজের সাথে কোন রকমেই খাপ খায় না। সে ফলদায়ক কথা বলতে পারে, কিন্তু আজেবাজে গল্প মারা তার স্বভাব বিরুদ্ধ। সে ব্যাংগ, কৌতুক, ও হালকা পরিহাস পর্যন্ত করতে পারে কিন্তু উচ্ছল ঠাট্টা-তামাসায় মেতে উঠতে পারে না, বাজে ঠাট্টা -মস্করা ও ভাঁড়ামি বরদাশত করতে পারে না এবং আনন্দ-ফূর্তি ও ভাঁড়ামির কথাবার্তাকে নিজের পেশায় পরিণত করতে পারে না। তার জন্য তো এমন ধরনের সমাজ হয় একটি স্থায়ী নির্যাতন কক্ষ বিশেষ, যেখানে কারো কান কখনো গালি-গালাজ, পরনিন্দা, পরচর্চা, অপবাদ, মিথ্যা কথা, কুরুচিপূর্ণ গান-বাজনা ও অশ্লীল কথাবার্তা থেকে নিরাপদ থাকে না। আল্লাহ

তাকে জান্নাতের আশা দিয়ে থাকেন তার একটি অন্যতম নিয়ামত তিনি এটাই বর্ণনা করেছেন যে, ----- " সেখানে তুমি কোন বাজে কথা শুনবে না।"

ইবনে কাসীর:

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ .

যাহারা অনর্থক কথাবার্তা ও কাজকর্ম হইতে বিরত থাকে। অর্থাৎ যাবতীয় বাতিল যাহা শিরককে শামিল করে বর্জন করিয়া চলে। কেহ কেহ বলেন, যাবতীয় গুনাহ ও পাপাচার ইহার অন্তর্ভুক্ত। কাহারও মতে যাবতীয় অনর্থক কথাবার্তা ও কাজকর্ম ইহার অন্তর্ভুক্ত।

যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَالَّذِيْنَ لَايَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ وَاِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا .

আর তাহারা এমন লোক যে যখন তাহারা কোন অনর্থক কাজ কর্মের নিকট দিয়ে অতিক্রম করে, তখন তাহারা ভদ্রভাবে উহা এড়াইয়া যায়। (সূরা ফুরকান ঃ ৭২) কাতাদাহ (র) বলেন, আল্লাহ্র কসম, তাহাদের নিকট আল্লাহ্র যেই নির্দেশ উহার কারণেই তাহারা ঐ সকল অনর্থক কাজকর্ম হইতে বিরত রহিয়াছে।

ফী যিলালিল কোরআন:

২। 'যারা যে কোনো বে-ফায়দা জিনিস থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।'.....

বে-ফায়দা, অর্থহীন বা মানব জীবনের জন্যে সত্যিকারে যার কোনো প্রয়োজন নেই এমন যা কিছু, তা কথা হোক, কাজ হোক, মূল্যায়ন হোক বা চেতনা হোক, একজন মোমেন অবশ্যই এগুলো থেকে দূরে থাকে। আবার এটাও একজন মোমেন খেয়াল করে যে, মানুষ যে কোনো কথা কাজ ও ব্যবহার করবে তাতে দুনিয়াবী কল্যাণ বেশী না আখেরাতের কল্যাণ বেশী। এ হিসাবে অবশ্যই সে আখেরাতের কল্যাণকে অগ্রাধিকার দেবে, আল্লাহর স্মরণ এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি পাওয়ার প্রত্যাশা তাকে সদা-সর্বদা সতর্ক করে রাখবে। তার মন-মগযে মানুষের অস্তিত্ব ও দিগন্ত ব্যাপী ছড়িয়ে থাকা প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী ও বস্তু নিচয়ের মধ্যে পরিব্যাপ্ত মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন-এর মহিমা বিরাজ করবে, সুনিপুণ ও বিস্ময়কর পরিচালনার কথা তার যুক্তি বুদ্ধির ওপর নিরন্তর প্রভাব বিস্তার করবে, আল্লাহর রাজ্যের সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা সকল রহস্যরাজি এবং তার চিন্তা স্রোতকে সৃষ্টিজগতের মধ্যে বিরাজিত এই মহাবিশ্বের বিশালত্ব ভীষণভাবে আন্দোলিত করবে। ধরার সব কিছু তার হৃদয়াবেগকে প্রচন্ডভাবে নাড়া দেবে, তার আকীদাকে নিয়ন্ত্রিত করবে তার গোটা সত্ত্বাকে পবিত্র করার ক্ষেত্রে এবং তার বিবেককে সকল প্রকার আবিলতা মুক্ত করতে গিয়ে তার ব্যবহারকে সুন্দর করবে। পরিপূর্ণ ঈমানী জীবন গড়ে তোলার লক্ষ্যে যেসব গুণাবলী প্রয়োজন সেগুলোকেও নিশ্চিত করবে, তাকে 'আমর বিল মারূফ' (অর্থাৎ শক্তি ক্ষমতার অধিকারী

হয়ে ভালো কাজের নির্দেশ দান) করতে এবং মন্দ কাজকে নিষেধ করতে উদ্বুদ্ধ করবে। নামাযের মাধ্যমে গড়ে ওঠা এসব মহামূল্যবান গুণ দলীয় জীবনকে মতভেদ, বিশৃংখলা ও আনুগত্যহীনতার কলুষতা থেকে মুক্ত করে। আল্লাহর পথে দৃঢ়তার সাথে টিকে থাকতে এবং এ দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্যে সকল প্রকার দুঃখ কষ্ট ও কঠোরতা স্বীকার করতে উদ্বুদ্ধ করে। সকল প্রকার চেষ্টা সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করার কাজে সাহায্য করার জন্যে, সকল প্রকার ঝুঁকি নিতে এবং শত্রুর যে কোনো আক্রমণ প্রতিহত করে দ্বীনকে মযবুত বানাতে তাকে উৎসাহিত করবে। এ কঠিন দায়িত্ব মোমেনের ঘাড় থেকে কখনো নেমে যায় না এবং সে কখনো এ দায়িত্ব থেকে উদাসীন হয় না, আর তার মনও কখনো তাকে এ দায়িত্ব থেকে রেহাই দেয় না। এ মহান ও কঠিন দায়িত্ব পালনকে সে ফরযে আইন অথবা ফরযে কেফায়া বলে বুঝে। ফরযে কেফায়া এই জন্যে মনে করা যায় যে মানুষ তো তার মানবীয় সীমাবদ্ধ প্রচেষ্টাই চালাতে পারে, যেহেতু তার বয়স সীমাবদ্ধ এবং তার শক্তিও সীমিত। তার নিজের জীবন দিয়ে সময় ও শ্রম দিয়ে যতোখানি সংশোধনী প্রচেষ্টা চালানো তার পক্ষে সম্ভব ততোখানিই সে করতে পারে, আর প্রত্যেক মোমেন ব্যক্তি তার সকল সম্পদ, শ্রম ও চূড়ান্ত প্রচেষ্টা দ্বারা তার আদর্শ কায়েম এর কাজ করার জন্যে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

অবশ্য মাঝে মাঝে মোমেন ব্যক্তি একটু ঢিল হয়ে যেতে পারে– বা সে একটু আমোদ আহল্লাদ করতে পারে, বিচ্ছিন্ন এসব সম্ভাবনাকে মানুষের জন্যে একেবারে নাকচ করে দেয়া যায় না, কিন্তু সামগ্রিকভাবে তারা 'ফুযুল' বা নিরর্থক কাজে জড়িয়ে পড়বে এবং তারা তাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থ বে-ফায়দা কোনো কিছুর জন্যে ব্যয় করবে এটা আশা করা যায় না।

Verse 4:

(وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ)

যাকাতের পথে সক্রিয় থাকে (those who pay alms-tax)

তাফহীম:

" যাকাত দেয়া" ও "যাকাতের পথে সক্রিয় থাকার' মধ্যে অর্থের দিক দিয়ে বিরাট ফারাক আছে।

একে উপেক্ষা করে উভয়কে একই অর্থবোধক মনে করা ঠিক নয়। এটা নিশ্চয় গভীর তাৎপর্যবহ যে, এখানে মু'মিনদের গুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে ----- এর সর্বজন পরিচিত বর্ণনাভংগী পরিহার করে ----- এর অপ্রচলিত বর্ণনা পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে।

আরবী ভাষায় যাকাত শব্দের দু'টি অর্থ হয়। একটি হচ্ছে "পবিত্রতা-পরিচ্ছন্নতা তথা পরিশুদ্ধি" এবং দ্বিতীয়টি "বিকাশ সাধন"- কোন জিনিসের উন্নতি সাধনে যেসব জিনিস প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় সেগুলো দূর করা এবং তার মৌলি উপাদান ও প্রাণবস্তুকে বিকশিত ও সমৃদ্ধ করা । এ দু'টি অর্থ মিলে যাকাতের পূর্ণ ধারণাটি সৃষ্টি হয়। তারপর এ শব্দটি ইসলামী পরিভাষায় পরিণত হলে এর দু'টি অর্থ প্রকাশ হয়। এক, এমন ধন-সম্পদ যা পরিশুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে বের করা হয়। দুই, পরিশুদ্ধ করার মূল কাজটি । যদি ----- বলা হয় তাহলে এর অর্থ হবে, তারা পরিশুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে নিজেদের সম্পদের একটি অংশ দেয় বা আদায় করে। এভাবে শুধুমাত্র সম্পদ দেবার মধ্যেই ব্যাপারটি সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু যদি ----- বলা হয় তাহলে এর অর্থ হবে, তারা পরিশুদ্ধ করার কাজ করে এবং এ অবস্থায় ব্যাপারটি শুধুমাত্র আর্থিক যাকাত আদায় করার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না বরং আত্মার পরিশুদ্ধি চরিত্রের পরিশুদ্ধি, জীবনের পরিশুদ্ধি, অর্থের পরিশুদ্ধি ইত্যাদি প্রত্যেকটি দিকের পরিশুদ্ধি পর্যন্ত এর ব্যাপ্তি ছড়িয়ে পড়বে। আর এছাড়াও এর অর্থ কেবলমাত্র নিজেরই জীবনের পরিশুদ্ধি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে না বরং নিজের চারপাশের জীবনের পরিশুদ্ধি পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়বে। কাজেই অন্য কথায় এ আয়াতের অনুবাদ হবে তারা পরিশুদ্ধির কার্য সম্পাদনকারী লোক।" অর্থাৎ তারা নিজেদেরকেও পরিশুদ্ধ করে এবং অন্যদেরকেও পরিশুদ্ধ করার দায়িত্ব পালন করে। তারা নিজেদের মধ্যে মৌল মানবিক উপাদানের বিকাশ সাধন করে এবং বাইরের জীবনেও তার উন্নতির প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। এ বিষয়বস্তুটি কুরআন মজীদের অন্যান্য স্থানেও বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন সূরা আ'লায় (14-15) বলা হয়েছে:

(قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ)

(وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ

"সফলকাম হয়েছে সে ব্যক্তি যে পবিত্রতা অবলম্বন করেছে এবং নিজের রবের নাম স্মরণ করে নামায পড়েছে।" সূরা শামসে বলা হয়েছে:

(قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا)

(وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا)

" সফলকাম হলো সে ব্যক্তি যে আত্মশুদ্ধি করেছে এবং ব্যর্থ হলো সে ব্যক্তি যে তাকে দলিত করেছে।"

কিন্তু এ দু'টির তুলনায় সংশ্লিষ্ট আয়াতটি ব্যাপক অর্থের অধিকারী। কারণ এ দু'টি আয়াত শুধুমাত্র আত্মশুদ্ধির ওপর জোর দেয় এবং আলোচ্য আয়াতটি স্বয়ং শুদ্ধিকর্মের গুরুত্ব বর্ণনা করে আর এ কর্মটির মধ্যে নিজের সত্তা ও সমাজ জীবন উভয়েরই পরিশুদ্ধি শামিল রয়েছে।

ইবনে কাসীর:

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فَاعِلُوْنَ .

অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে আয়াতে উল্লেখিত যাকাত দ্বারা মালের যাকাত বুঝান হইয়াছে। আর আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ হইয়াছে এবং যাকাতের নির্দেশ হইয়াছে দ্বিতীয় হিজরীতে মদীনায়। কিন্তু যেই বিষয়টি অধিক প্রকাশ্য, তাহা হইল মূলত যাকাত মক্কায়-ই ফরয হইয়াছে। অবশ্য মদীনায় উহার নিসাব ও পরিমাণ নির্ধারণ করা হইয়াছে। মক্কায় অবতীর্ণ সূরা আন'আম-এর মধ্যে ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ ফসল কাটিবার দিনের উহার হক্ যাকাত দান কর।

অবশ্য ইহারাও সম্ভাবনা রহিয়াছে যে, الزكٰوة। এর অর্থ শিরক ও গোপনীয় ময়লা হইতে আত্মার পবিত্রতা।

যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا .

যেই ব্যক্তি আত্মাকে পবিত্র করিয়াছে সে অবশ্যই সফল হইয়াছে আর যেই ব্যক্তি উহাকে কলুষিত করিয়াছে সে ধংস হইয়াছে। (সূরা শামস ঃ ৯-১০)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِيْنَ الَّذِيْنَ لَايُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ

আর সেই মুশরিকদের জন্য চরম অকল্যাণ যাহার শিরক হইতে আত্মাকে পবিত্র করেনা। (সূরা হা-মীম আস-সাজদা ঃ ৭)

আয়াতের দুই তাফসীরের ইহা একটি।'অবশ্য আলোচ্য আয়াতে উভয় প্রকার যাকাত উদ্দেশ্য হইতে পারে অর্থাৎ আত্মার পবিত্রতা ও মালের যাকাত। মালের যাকাতের মাধ্যমেও মু'মিনের এক প্রকার আত্মশুদ্ধি হইয়া থাকে। কামিল মু'মিন আত্মশুদ্ধিও করে এবং মালের যাকাতও আদায় করে।

ফী যিলালিল কোরআন:

৩। মোমেনদের তৃতীয় গুণ হচ্ছে 'তারা রীতিমতো যাকাত আদায় করবে অর্থাৎ আল্লাহর দিকে এগিয়ে যাওয়ার পর অবশ্যই তারা বাজে কথা এবং বে-ফায়দা কাজ ও ব্যবহার পরিহার করে এবং এইভাবে তাদের অন্তর ও সম্পদকে তারা পবিত্র করবে। অন্তরের পবিত্রতা অর্জন করবে, যাবতীয় সংকীর্ণতা পরিত্যাগ করবে এবং মানবতাকে সমুন্নত করার জন্যে তারা সর্বদা সচেষ্ট থাকবে, শয়তান মানুষকে দারিদ্রের ভয় দেখিয়ে যে ওয়াসওয়াসা দেয় সেই মরদূদ শয়তানের ওপর অবশ্যই তারা বিজয়ী হবে, তারা আল্লাহর কাছেই প্রতিদান ও পুরস্কার পাওয়ার জন্যে আশান্বিত থাকবে। হালাল পথে অর্জিত অর্থ সম্পদের পবিত্রতা তাদের জীবনের বাকি সব কিছুকে পবিত্র করে তুলবে। জরুরী অবস্থা ছাড়া তারা নিজেদের স্বার্থের কথাটাকে মোটেই বড় করে দেখবে না এবং সব সময় শুধু নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্যেই সংগ্রাম করবে না– অন্যদের কথাও মনে রাখবে। মোমেনদের পারস্পরিক সম্পর্ক হবে এতো মধুর, এতো সহানুভূতিপূর্ণ এবং পরস্পরের প্রতি এতো আস্থাপূর্ণ যে কারো সততা ও বিশ্বস্ততা সম্পর্কে তারা কোনো সন্দেহ পোষণ করবে না। প্রকৃত ঈমানদার মুসলমানরা অবশ্যই তাদের দলীয় জীবনের সংহতি বজায় রাখার জন্যে পরস্পর দরদী এবং আস্থাভাজন হবে, তারা হবে সুখে ও দুঃখে, সংকটে সমস্যায় দারিদ্র ও সচ্ছলতার সময়ে ও আনন্দঘন মুহূর্তে ও বেদনায় পরস্পরের প্রতি দরদী, প্রত্যেক ব্যক্তির স্বার্থ যাতে অক্ষুন্ন থাকে তার জন্যে গোটা সমাজের মধ্যে এক তীব্র অনুভূতি বজায় থাকবে, অক্ষমদের সমস্যাকে গোটা দলের সামষ্টিক সমস্যা বিবেচনায় তার সমাধানের জন্যে তারা সামগ্রিকভাবে চেষ্টা চালাবে এবং বিচ্ছিন্নতা ও ভাংগন থেকে তার দল ও দলীয় যিন্দেগীকে রক্ষা করা হবে গোটা দলের যৌথ দায়িত্ব।

Verse 5:

(وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ

নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে (those who guard their chastity)

তাফহীম:

এর দু'টি অর্থ হয়। এক, নিজের দেহের লজ্জাস্থানগুলো ঢেকে রাখে। অর্থাৎ উলংগ হওয়া থেকে নিজেকে রক্ষা করে এবং অন্যের সামনে লজ্জাস্থান খোলে না। দুই, তারা নিজেদের সততা ও পবিত্রতা সংরক্ষণ করে। অর্থাৎ যৌন স্বাধীনতা দান করে না এবং কামশক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে লাগামহীন হয় না।

ফী যিলালিল কোরআন:

৪। মোমেনদের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, 'তারা তাদের লজ্জাস্থানগুলোর হেফাযতকারী হবে।' প্রকৃতপক্ষে এটাই হচ্ছে রূহ বা আত্মার হেফাযত এবং মুসলমানদের গোটা দলের হেফাযতের উপায়ও এখানে। এই হেফাযতের মাধ্যমেই ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজকে রক্ষা করা সম্ভব হয়। লজ্জাস্থানসমূহকে হেফাযতের মাধ্যমে হালাল বিষয়গুলো বহির্ভূত অন্য সব কিছুর খারাবী থেকে বাঁচা যায়। অন্তরের হেফাযতের মাধ্যম হালাল বিষয় ছাড়া অন্যসব কিছু নিয়ে মাথা ঘামানো থেকে দূরে থাকা যায় এবং বে-হেসাবী প্রবৃত্তির চাহিদা মেটানোকে যখন মানুষ কন্ট্রোল করে তখন গোটা দলের মধ্যে শান্তি-শৃংখলা ও নিরাপত্তা বিরাজ করে এবং ব্যক্তি ও বংশ পরিবারগুলো বিভিন্নমুখী ভাংগন থেকে রক্ষা পায়।

আর যে মানব গোষ্ঠীর মধ্যে অনিয়মিত ও অনিয়ন্ত্রিতভাবে যৌনাচার চলে; সেখানে অবশ্যই শান্তি শৃংখলা বিনষ্ট হয় এবং পারস্পরিক অবিশ্বাস ও আস্থা নষ্ট হয়। কেননা পারস্পরিক অবিশ্বাসের কারণে পরিবার তথা মানব সমাজে কোনো শান্তি থাকে না আর পরিবারের সদস্যদের মধ্যেও কারো প্রতি কারো কোনো মর্যাদাবোধ থাকে না, যেহেতু পরিবারই হচ্ছে সমাজ সংগঠনের প্রথম ভিত্তি। এই সূতিকাগারেই মানব শিশুর জন্ম ও বৃদ্ধি। এখানকার শান্তি, নিরাপত্তা, স্থিতিশীলতা ও পবিত্রতার রক্ষাকবচ হচ্ছে পারস্পরিক বিশ্বাস ও আস্থা, আর তা আল্লাহর ভয়ে গড়ে ওটা সুনিয়ন্ত্রিত যৌন ব্যবস্থার মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এখানকার নিরাপত্তা ও শৃংলার কারণে বাপ-মা নিশ্চিন্তে ও তৃপ্তির সাথে এই সূতিকাগারে তাদের বাচ্চাকে প্রতিপালন করে। এই সূতিকাগারের পরিচালক তো এই পিতামাতাই। এদের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস ও মহাব্বত গড়ে তোলা ও এদের নিরাপত্তা বিধান করা দেশের আইন সংস্থা তথা সরকারের দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালনে সেই সরকারই সফল হতে পারে যার মধ্যে আল্লাহর ভয় ও তাঁর আনুগত্য আছে।

যে জনসমাজে লাগামহীন যৌনচার চলতে থাকে সেটা হচ্ছে এক পাপপঙ্কিলময় সমাজ, সে সমাজ গোটা মানব জাতিকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করে, মানুষকে যে মানদন্ড এই অপরাধ করা থেকে বাঁচাতে পারে তা হচ্ছে ইচ্ছার দৃঢ়তা এবং সদিচ্ছাকে বিজয়ী করার সংকল্প। এর সাথে প্রবৃত্তির চাহিদাকে সুন্দর ও ফলপ্রসূভাবে নিয়ন্ত্রণ করার মনোভাবও থাকতে হবে। এই নিয়ন্ত্রণ ও সুশৃংখলা আজকের আধুনিক সমাজে কিছুতেই আশা করা যায় না, যেখানে নিয়মিত মেলামেশা বাচ্চাদের মনের লজ্জা শরমকে দূর করে দিচ্ছে। বাচ্চারা জন্মের পর থেকে সব থেকে বেশী কাছে পায় বাপ-মাকে, নিজেদের অজান্তেই তাদের ভাবধারা, অভ্যাসসমূহ এবং কাজ কর্ম তাদের অন্তরে গভীরভাবে অংকিত হতে থাকে। সন্তানরা মায়ের পর সর্বপ্রথম বাপকেই চেনে এবং তার অনুসরণ করে। এর ব্যতিক্রম যদি হয় তা ব্যতিক্রমই, সেটাকে সাধারণ নিয়ম বলে কেউ মেনে নেয় না। অপরদিকে রয়েছে নিকৃষ্ট পশুদের নিয়ম, সেখানে নরপশুর শুক্র মাদী পশুর জরায়ুতে পৌছে দেয়া হয়, এর ফলে যে বাচ্চা পয়দা হয়। সে জানে না তার বাপ-কে, সে জানে না সে কেমন করে ধরা পৃষ্ঠে আগমন করলো এবং কোন উপায়ে হলো একটি জীব হিসাবে তার সৃষ্টি হলো।

এখানে পুরুষরা কোথায় তাদের বীজ বপণ করবে সেই স্থানগুলোকে আল কোরআন সীমাবদ্ধ করে দিয়ে বলছে,

'একমাত্র তাদের স্ত্রীরা ও সেই সকল দাসী যাদের ওপর তাদের ন্যায়ানুগ কর্তৃত্ব রয়েছে, সেখানে তাদেরকে কোনো দোষ দেয়া হবে না।'

বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে স্বামী স্ত্রীর জীবন যাপন করা বা বৈবাহিক সম্পর্কের বিষয়টি নিয়ে কোনো তর্ক-বিতর্ক করার সুযোগ নেই, কেননা সকল যামানায়, সকল দেশে এবং সকল সমাজেই লোকদের মধ্যে এটা হচ্ছে সর্বজন স্বীকৃত নিয়ম। এখন দাসীর ওপর যতো মানুষের ওপর কর্তৃত্ব লাভের প্রশ্নটির একটু বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন' গ্রন্থের দ্বিতীয় খন্ডে দাসীদেরকে ব্যবহার করা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এসেছে। সেখানে আলোচনা করা হয়েছে যে, যখন দাসী সম্পর্কিত এ আয়াতগুলো নাযিল হয়, তখন সারাবিশ্বে আন্তর্জাতিকভাবে দাস প্রথা চালু ও স্বীকৃত ছিলো। আর এখনও বন্দী-বিনিময় না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধবন্দীদেরকে দাস দাসী হিসাবে ব্যবহারের রীতি চালু আছে, যেহেতু ইসলাম মুসলমানরা সেসব দেশ ও শক্তিসমূহের সাথে যুদ্ধরত ছিলো– যারা বস্তুগত শক্তিতে এগিয়ে ছিলো। সেই সময়ে একতরফাভাবে তাদের ওপর দাসত্ব প্রথা রহিত করার নিয়ম চাপিয়ে দেয়া সম্ভবও ছিলো না। এটা করতে গেলে (ম হিলাসহ) মুসলমান বন্দীরা অবশ্যই শত্রু দেশের হাতে থেকে যেতো, এজন্যে যুদ্ধবন্দী ছাড়া দাসত্বপ্রথার অন্যান্য উৎসগুলোকে ইসলাম গুটিয়ে ফেলেছে এবং গোটা মানব জাতির জন্যে বন্দী বিনিময়ের ভারসাম্যপূর্ণ নীতির পক্ষে স্বীকৃতি আদায় করতে সক্ষম হয়েছে।

এই সময় ইসলামী সেনাদলের ছাউনীতে বন্দীনীদের আগমন শুরু হলো। যখন বন্দী বিনিময় নিয়ম অনুসারে বন্দীবিনিময়ও হতে থাকলো তখন এই দাসীদের রাখার প্রয়োজনে তাদেরকে কিভাবে রাখা হবে তার জন্যে নীতিও নির্ধারণ করে দেয়া হলো। বিবাহের মাধ্যমে তাদেরকে স্ত্রীর মর্যাদা দেয়া যাবে না, কিন্তু তাদেরকে স্ত্রীর মতো ব্যবহারের জন্যে ইসলাম অনুমতি দিলো। স্থির হলো যাদের জন্যে এদেরকে ভাগ করে দেয়া হবে তারা এদেরকে ব্যবহার করতে পারবে এবং এক এক জনকে এক এক জনের পূর্ণ কর্তৃত্বে সোপর্দ করা হবে। তবে, ওদের মধ্যে কেউ যদি ইসলাম অনুমোদিত পন্থাসমূহের যে কোনো একটি অনুযায়ী মুক্তি লাভ করতে চায় তাহলে তাকে আর সেভাবে ব্যবহার করা যাবে না।

এভাবে ব্যবহার করার অনুমতি সম্ভবত এই অবস্থাকে সামনে রেখে দেয়া হয়েছে যে, মানুষ হিসাবে সে বন্দী মহিলাদেরও তো প্রাকৃতিক প্রয়োজন আছে। যদি তাদের জন্যে অনুমোদিত কোনো পদ্ধতি খোলা না রাখা হয় তাহলে উচ্ছৃংখলতার নিন্দনীয় অবস্থায় তারা পতিত হবে এবং সেই দায়িত্বহীন পন্থায় তারা জীবন যাপন করবে যা আজকের আধুনিক সমাজে সেনাঘাঁটিগুলোতে যুদ্ধ বিনিময় চুক্তি মেনে নেয়া সত্তেও অবাধে চলছে। এমন যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা ইসলাম অনুমোদন করে না। কিন্তু এটাকে ইসলাম কোনো স্থায়ী ব্যবস্থা হিসাবেও রেখে দেয়নি, বরং ধীরে ধীরে ও পর্যায়ক্রমে তাদেরকে বিভিন্ন পন্থায় স্ত্রীর মর্যাদা বা স্বাধীন হওয়ার সুযোগ দেয়া হয়েছে, যেমন, এক, বন্দী বিনিময় চুক্তির ভিত্তিতে স্বাধীনতা লাভ করে তারা নিজেদের দেশে ফিরে গিয়ে নিজ নিজ পরিবারের সাথে মিলিত হতে পারে। দুই, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মানসে বা কারো কোনো গুনাহের কাফফারা দান করতে গিয়ে কেউ কোনো দাসীকে মুক্তি দিলে সে দাসী মুক্তি পেতে পারে। তিন, অর্থের বিনিময়ে মুক্তি লাভে ইচ্ছুক কোনো মহিলা নিজেকে মুক্ত করতে পারে। চার, মনিবের ঔরসজাত কোনো সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পর সে মনিবের মৃত্যু হলে সে দাসী আপনা থেকেই স্বাধীন হয়ে যাবে। পাঁচ, মনিব যদি কোনো সময়ে তার দাসীর চেহারার ওপর আঘাত করে, তাহলে তার কাফফারা হিসাবে সে দাসী মুক্তি লাভ করবে। (৩)

যাই হোক, বন্দী রাখা বা দাসত্ব প্রথাকে ইসলাম যুদ্ধকালীন সময়ের জন্যে সাময়িকভাবে অনুমোদন করেছে এবং এটাকে একটা অপরিহার্য সাময়িক প্রয়োজন বলে জানিয়েছে। বন্দী বিনিময়ের প্রয়োজন অনুভব করে সারা বিশ্বে এখন পারস্পরিক সম মর্যাদার ভিত্তিতে যে সমঝোতা গড়ে উঠেছে তারই ভিত্তিতে যুদ্ধ বন্দী বিনিময় আন্তর্জাতিকভাবে এখন স্বীকৃত এক নীতি হিসাবে গৃহীত হয়েছে। এটাকে কখনো ইসলামের সমাজ বিধির অংশ মনে করা হয়নি। এরশাদ হয়েছে,

'অতপর, যদি কোনো ব্যক্তি এই নির্ধারিত সীমা লংঘন করে (যারাই এ সীমার বাইরে যাবে) তারাই হবে সীমা অতিক্রমকারী।' .....

অর্থাৎ, স্ত্রী ও দাসী ছাড়া অন্য যে কোনো পদ্ধতিতে যারাই যৌন সম্পর্ক স্থাপন করবে তারাই হালাল পথের বাইরে চলে যাবে, পরিষ্কার হারামে পতিত হবে। এ হারাম অবস্থায় যে পৌছে যাবে সে নিজেকে ধ্বংসের দিকেই এগিয়ে দেবে, কারণ এ চেতনা তাকে অনবরত দংশন করতে থাকবে যে সে এমন চারণ ক্ষেত্রে বিচরণ করছে যা তার জন্যে হালাল নয়। এভাবে সে নিজেকে এবং নিজের ঘরকে ধ্বংস করবে, কারণ (হারাম পথে যাওয়ার কারণে) তার মনে কোনো শান্তি থাকবে না এবং নিজেকে সে আযাব থেকে নিরাপদও মনে করতে পারবে না এবং সে সমাজকেও সে ধ্বংস করবে, কারণ তার সীমাহীন লোভের নেকড়েগুলো এখানে ওখানে নির্বিচারে যারা বিচরণ করে সেই শান্তি বেষ্টনীকে ধ্বংস করে দেবে যাকে ইসলাম রক্ষা করতে চেয়েছে।

Verse 6:

(إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

নিজেদের স্ত্রীদের ও অধিকারভুক্ত বাঁদীদের ছাড়া, এদের কাছে (হেফাজত না করলে) তারা তিরষ্কৃত হবে না, (Except from their wives or those their right hands possess,1 for indeed, they will not be blamed)

Verse 7:

(فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

তবে যারা এর বাইরে আরো কিছু চাইবে তারাই হবে সীমালংঘনকারী, (but whoever seeks beyond that are the transgressors;)

তাফহীম:

এটি একটি প্রাসংগিক বাক্য। "লজ্জাস্থানের হেফাজত করে" বাক্যাংশটি থেকে যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয় তা দূর করার জন্য এ বাকটি বলা হয়েছে। দুনিয়াতে পূর্বেও একথা মনে করা হতো এবং আজো বহু লোক এ বিভ্রান্তিতে ভুগছে যে, কামশক্তি মূলত একটি খারাপ জিনিস এবং বৈধ পথে হলেও তার চাহিদা পূরণ করা সৎ ও আল্লাহর প্রতি অনুগত লোকদের জন্য সংগত নয়। যদি কেবল মাত্র "সফলতা লাভকারী মু'মিনরা নিজেদের লজাস্থানের হেফাজত করে" এতটুকু কথা বলেই বাক্য খতম করে দেয়া হতো তাহলে এ বিভ্রান্তিটি জোরদার হয়ে যেতো। কারণ এর এ অর্থ করা যেতে পারতো যে, তারা মালকোঁচা মেরে থাকে, তারা সন্যাসী ও যোগী এবং বিয়ে-শাদীর ঝামেলায় তারা যায় না। তাই একটি প্রাসংগিক বাক্য বাড়িয়ে দিয়ে এ সত্যটি সুস্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, বৈধ স্থানে নিজের প্রবৃত্তির কামনা পূর্ণ করা কোন নিন্দনীয় ব্যাপার নয়। তবে কাম প্রবৃত্তির সেবা করার জন্য এ বৈধ পথ এড়িয়ে অন্য পথে চলা অবশ্যই গোনাহর কাজ।

এ প্রাসংগিক বাক্যটি থেকে কয়েকটি বিধান বের হয়। এগুলো সংক্ষেপে এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে:

এক: লজ্জাস্থান হেফাজত করার সাধারণ হুকুম থেকে দু'ধরনের স্ত্রীলোককে বাদ দেয়া হয়েছে। এক, স্ত্রী। দুই ----------। স্ত্রী (-----) শব্দটি আরবী ভাষার পরিচিত ব্যবহার এবং স্বয়ং কুরআনের সুস্পষ্ট বক্তব্য অনুযায়ী কেবলমাত্র এমনসব নারী সম্পর্কে বলা হয় যাদেরকে যথারীতি বিবাহ করা হয়েছে এবং আমাদের দেশে প্রচলিত "স্ত্রী" শব্দটি এরি সমার্থবোধক। আর ---------- বলতে যে বাঁদী বুঝায় আরবী প্রবাদ ও কুরআনের ব্যবহার উভয়ই তার সাক্ষী। অর্থাৎ এমন বাঁদী যার ওপর মানুষের মালিকানা অধিকার আছে। এভাবে এ আয়াত পরিষ্কার বলে দিচ্ছে বিবাহিতা স্ত্রীর ন্যায় মালিকানাধীন বাঁদীর সাথেও যৌন সম্পর্ক স্থাপন করা বৈধ্য এবং বৈধতার ভিত্তি বিয়ে নয় বরং মালিকানা। যদি এ জন্যও বিষেয় শর্ত হতো তাহলে একে স্ত্রী থেকে আলাদা করেও বর্ণনা করার প্রয়োজন ছিল না। কারণ বিবাহিত হলে সে ও স্ত্রীর পর্যায়ভূক্ত হতো। বর্তমানকালের কোন কোন মুফাসসির যারা বাঁদীর সাথে যৌন সম্ভোগ স্বীকার করেননি। তারা সূরা নিসার (২৫ আয়াত) ----- আয়াতটি

থেকে যুক্তি আহরণ করে একথা প্রমাণ করতে চান যে, বাঁদীর সাথে যৌন সম্ভোগও কেবলমাত্র বিয়ের মাধ্যমেই করা যেতে পারে। কারণ সেখানে হুকুম দেয়া হয়েছে, যদি আর্থিক দুরবস্থার কারণে তোমরা কোন স্বাধীন পরিবারের মেয়েকে বিয়ে করার ক্ষমতা না রাখো তাহলে কোন বাঁদীকে বিয়ে করো। কিন্তু এসব লোকের একটি অদ্ভুত বৈশিষ্ট লক্ষ করার মতো। এরা একই আয়াতের একটি অংশকে নিজেদের উদ্দেশ্যের পক্ষে লাভজনক দেখতে পেয়ে গ্রহণ করে নেন, আবার সে একই আয়াতের যে অংশটি এদের উদ্দেশ্যে বিরোধী হয় তাকে জেনে বুঝে বাদ দিয়ে দেন। এ আয়াতে বাঁদীদেরকে বিয়ে করার নির্দেশ যেসব শব্দের মাধ্যমে দেয়া হয়েছে সেগুলো হচ্ছে :

"কাজেই এ বাঁদীদের সাথে বিবাহ বন্ধণে আবদ্ধ হয়ে যাও এদের অভিভাবকদের অনুমতিক্রমে এবং এদেরকে পরিচিত পদ্ধতিতে মোহরানা প্রদান করো।" এ শব্দগুলো পরিষ্কার বলে দিচ্ছে, এখানে বাঁদীর মালিকের বিষয় আলোচনার বিষয়বস্তু নয় বরং এমন ব্যক্তির বিষয় এখানে আলোচনা করা হচ্ছে, যে স্বাধীন মেয়ে বিয়ে করার ব্যয় ভার বহন করার ক্ষমতা রাখে না এবং এ জন্য অন্য কোন ব্যক্তির মালিকানাধীন বাঁদীকে বিয়ে করতে চায়। নয়তো যদি নিজেরই বাঁদীকে বিয়ে করার ব্যাপার হয় তাহলে তার এ "অভিভাবক" কে হতে পারে যার কাছ থেকে তার অনুমতি নেবার প্রয়োজন হয়? কিন্তু কুরআনের সাথে কৌতুককারীরা কেবলমাত্র ------ কে গ্রহণ করেন অথচ তার পরেই যে ----- এসেছে তাকে উপেক্ষা করেন। তাছাড়াও তারা একটি আয়াতের এমন অর্থ বের করেন যা একই বিষয়বস্তু সম্পর্কিত কুরআনের অন্যান্য আয়াতের সাথে সংঘর্ষশীল। কোন ব্যক্তি যদি নিজের চিন্তাধারার নয় বরং কুরআন মজীদের অনুসরণ করতে চায় তাহলে তাকে অবশ্যি সূরা নিসার ৩-৩৫, সূরা আহযাবের ৫০-৫২ এবং সূরা মা'আরিজের ৩০ আয়াতকে সূরা মুমিনূনের এ আয়াতের সাথে মিলিয়ে পড়তে হবে। এভাবে সে নিজেই এ ব্যাপারে কুরআনের বিধান কি তা জানতে পারবে। (এ বিষয়ে আরো বেশী বিস্তারিত জানতে হলে পড়ুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা নিসা, ৪৪টীকা; তাফহীমাত (মোদূদী রচনাবলী) ২য় খণ্ড ২৯০ থেকে ৩২৪ পৃ: এবং রাসায়েল ও মাসায়েল ১ম খণ্ড, ২৪ থেকে ৩৩৩ পৃষ্ঠা)

দুই: ---------- বাক্যাংশে ----- শব্দটি একথা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করে দেয় যে, এ আনুসংগিক বাক্যে আইনের যে ধারা বর্ণনা করা হচ্ছে তার সম্পর্ক শুধু পুরুষদের সংগে । বাকি ----- থেকে নিয়ে ----- পর্যন্ত পুরো আযাতটিতেই সর্বনাম পুং লিঙ্গে বর্ণিত হওয়া সত্বেও পুরুষ ও নারী উভয়েই শামিল রয়েছে। কারণ আরবী ভাষায় পুরুষ ও নারীর সমষ্টির কথা যখন বলা হয় তখণ সর্বনামের উল্লেখ পুং লিংগেই করা হয়। কিন্তু এখানে ---------- এর হুকুমের বাইরে রেখে ----- শব্দ ব্যবহার করার মাধ্যমে একথা সুস্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, এ ব্যক্তিক্রমটি পুরুষদের জন্য, মেয়েদের জন্য নয়। যদি "এদের কাছে" না বলে "এদের থেকে " হেফাজত না করলে তাদেরকে নিন্দনীয় নয় বলা হতো, তাহলে অবশ্যই এ হুকুমটিও নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য কার্যকর হতে পারতো। এ সূক্ষ্ম বিষয়টি না বুঝার কারণে হযরত উমরের (রা) যুগে জনৈকা মহিলা তাঁর গোলামের সাথে যৌন সম্ভোগ করে বসেছিলেন। সাহাবায়ে কেরামের মজলিসে শূরায় যখন তাঁর বিষয়টি পেশ হলো তখন সবাই এক

বাক্যে বললেন : ---------- অর্থাৎ "সে আল্লাহর কিতাবের ভুল অর্থ গ্রহণ করেছে। " এখানে কারো মনে যেন এ সন্দেহ সৃষ্টি না হয় যে, এ ব্যতিক্রম যদি শুধুমাত্র পুরুষদের জন্য হয়ে থাকে তাহলে স্ত্রীদের জন্য তাদের স্বামীরা কেমন করে হালাল হলো? এ সন্দেহটি সঠিক না হবার কারণ হচ্ছে এই যে, যখন স্ত্রীদের ব্যাপারে স্বামীদেরকে পুরুষাংগ হেফাজত করার হুকুমের বাইরে রাখা হয়েছে তখন নিজেদের স্বামীদের ব্যাপারে স্ত্রীরা আপনা আপনিই এ হুকুমের বাইরে চলে গেছে। এরপর তাদের জন্য আর আলাদা সুস্পষ্ট বক্তব্যের প্রয়োজন থাকেনি। এভাবে এ ব্যক্তিক্রমের হুকুমের প্রভাব কার্যত শুধুমাত্র পুরুষ ও তার মালিকানাধীন নারী পর্যন্তই সামীবদ্ধ হয়ে যায় এবং নারীর জন্য তার গোলামের সাথে দৈহিক সম্পর্ক হারাম গণ্য হয়। নারীর জন্য এ জিনিসটি হারাম গণ্য করার কারণ হচ্ছে এই যে, গোলাম তার প্রবৃত্তির কামনা পূর্ণ করতে পারে কিন্তু তার ও তার গৃহের পরিচালকা হতে পারে না এবং এর ফলে পারিবারিক জীবনের সংযোগ ও শৃংখলা টিলা থেকে যায়।

তিন: "তবে যারা এর বাইরে আরো কিছু চাইবে তারাই হবে সীমালংঘণকারী"-এ বাক্যটি ওপরে উল্লেখিত দু'টি বৈধ আকার ছাড়া যিনা বা সমকাম অথবা পশু-সংগম কিংবা কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য অন্য যাই কিছু হোক না কেন সবই হারাম করে দিয়েছে। একমাত্র হস্তমৈথুনের (Masturbation) ব্যাপারে ফকীহগণের মধ্যে মতবিরোধ আছে। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল একে জায়েয গণ্য করেন। ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেঈ একে চূড়ান্ত হারা বলেন। অন্যদিকে হানাফীদের মতে যদিও এটি হারাম তবুও তারা বলেন, যদি চরম মুহূর্তে কখনো কখনো এ রকম কাজ করে বসে তাহলে আশা করা যায় তা মাফ করে দেয়া হবে।

চার: কোন কোন মুফাসসির মুতা' বিবাহ হারাম হবার বিষয়টিও এ আয়াত থেকে প্রমাণ করেছেন। তাঁদের যুক্তি হচ্ছে, যে মেয়েকে মুতা' বিয়ে করার হয় সে না স্ত্রীর পর্যায়ভুক্ত, না বাঁদীর। বাঁদী তো সে নয় একথা সুস্পষ্ট, আবার স্ত্রীও নয়। কারণ স্ত্রীর মর্যাদা লাভ করার জন্য যতগুলো আইনগত বিধান আছে তার কোনটাই তার ওপর আরোপিত হয় না। সে পুরুষের উত্তরধিকারী য় না, পুরুষও তার উত্তরাধিকারী হয় না। তার জন্য ইদ্দত নেই, তালাকও নেই, খোরপোশ নেই এবং ঈলা, যিহার ও লি'আন ইত্যাদি কোনটিই নেই। বরং সে চার স্ত্রীর র্নিধারিত সীমানার বাইরে অবস্থান করছে কাজেই সে যখন "স্ত্রী" ও "বাঁদী" কোনটার সংজ্ঞায় পড়ে না তখন নিশ্চয়ই সে 'এর বাইরে আরো কিছু'র মধ্যে গণ্য হবে। আর এ আরো কিছু যারা চায় তাদেরকে কুরআন সীমালংঘনকারী গণ্য করেছে। এ যুক্তিটি অনেক শক্তিশালী। তবে এর মধ্যে একটি দূর্বলতার দিকও আছে। আর এ দূর্বলতাটি হচ্ছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুতা' হারামহবার শেষ ও চূড়ান্ত ঘোষণা দেন মক্কা বিজয়ের বছরে। এর পূর্বে অনুমতির প্রমাণ সহী হাদীসগুলোতে পাওয়া যায়। যদি একথা মেনে নেয়া যে, মুতা' হারাম হবার হুকুম কুরআনের এ আয়াতের মধ্যেই এসে গিয়েছিল আর এ আয়াতটির মক্কী হবার ব্যাপারে সবাই একমত এবং এটি হিজরতের কয়েক বছর আগে নাযিল হয়েছিল, তাহলে কেমন করে ধারণাকরা যেতে পারে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা বিজয় পর্যন্ত একে জায়েয রেখেছিলেন? কাজেই একথা বলাই বেশী নির্ভূল যে, মুতা' বিষয়ে কুরআন মজীদের কোন সুস্পষ্ট ঘোষণার মাধ্যেম নয় বরং নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া

সাল্লামের সুন্নাতের মাধ্যমেই হারাম হয়েছে। সুন্নাতের মধ্যে যদি এ বিষয়টির সুস্পষ্ট ফায়সালা না থাকতো তাহলে নিছক এ আয়াতের ভিত্তিতে এর হারাম হোয়ার ফায়সালা দেয়া কঠিন ছিল। মুতা'র আলোচনা যখন এসে গেছে তখন আরো দু'টি কথা স্পষ্ট করে দেয়া সংগত বলে মনে হয়। এক, এর হারাম হওয়ার বিষয়টি স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকেই প্রমাণিত । কাজেই হযরত উমর (রা) একে হারাম করেছেন, একথা বলা ঠিক নয়। হযরত উমর (রা) এ বিধিটির প্রবর্তক বা রচয়িতা ছিলেন না বরং তিনি ছিলেন কেবলমাত্র এর প্রচারক ও প্রয়োগকারী । যেহেতু এ হুকুমটি রসূলূল্লাহ (সা) তার আমলের শেষের দিকে দিয়েছিলেন এবং সাধারণ লোকদের কাছে এটি পৌছেনি তাই হযরত উমর (রা) এটিকে সাধারণ্যে প্রচার ও আইনের সাহায্য কার্যকরী করেছিলেন। দুই, শীয়াগণ মুতা'কে সর্বতোভাবে ও শর্তহীনভাবে মুবাহ সাব্যস্ত করার যে নীতি অবলম্বন করেছেন কুরআন ও সুন্নাতের কোথাও তার কোন অবকাশই নেই। প্রথম যুগের সাহাবা, তাবেঈ ও ফকীহদের মধ্যে কয়েকজন যারা এর বৈধতার সমর্থক ছিলেন তারা শুধুমাত্র অনন্যোপায় অবস্থায় অনিবার্য পরিস্থিতিতে এবং চরম প্রয়োজনের সময় একে বৈধ গণ্য করেছিলেন । তাদের একজনও একে বিবাহের মতো শর্তহীন মুবাহ এবং সাধারণ অবস্থায় অবলম্বনযোগ্য বলেননি। বৈধতার প্রবক্তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য হিসেবে পেশ করা হয় হযরত ইবনে আব্বাসের (রা) নাম । তিনি নিজের মত এভাবে ব্যক্ত করেছেন :---------- (এ হচ্ছে মৃতের মতো, যে ব্যক্তি অনিবার্য ও অনন্যোপায় অবস্থার শিকার হয়েছে তার ছাড়া আর কারোর জন্য বৈধ নয়।)আবার তিনি যখন দেখলেন তার এ বৈধতার অবকাশ-দানমূলক ফতোয়া থেকে লোকেরা অবৈধ স্বার্থ উদ্ধার করে যথেচ্ছভাবে মুতা' করতে শুরু করেছে এবং তাকে প্রয়োজনের সময় পর্যন্ত মুলতবী করছে না তখন তিনি নিজের ফতওয়া প্রত্যাহার করে নিলেন । ইবনে আব্বাস ও তার সমমনা মুষ্টিমেয় কয়েকজন তাদের এ মত প্রত্যাহার করেছিলেন কিনা এ প্রশ্নটি যদি বাদ দেয়াও যায় তাহলে তাদের মত গ্রহণকারীরা বড় জোর "ইযতিহার"তথা অনিবার্য ও অন্যন্যোপায় অবস্থায় একে বৈধ্য বলতে পারেন । অবাধ ও শর্তহীন মুবাহ এবং প্রয়োজন ছাড়াই মুতা' বিবাহ করা এমন কি বিবাহিত স্ত্রীদের উপস্থিতিতেও মুতা-বিবাহিত স্ত্রীদের সাথে যৌন সম্ভোগ করা এমন একটি সেচ্ছাচার যাকে সুস্থ ও ভারসাম্যপূর্ন রুচিবোধও কোনদিন বরদাশত করেনা । ইসলামী শরীয়াত ও রসূল বংশোদ্ভূত ইমামদেরকে এর সাথে জড়িত মনে করার তো কোন প্রশ্নই উঠে না । আমি মনে করি, শীয়াদের মধ্য থেকে কোন ভদ্র ও রুচিবান ব্যক্তিও তার মেয়ের জন্য কেউ বিবাহের পরিবর্তে মুতা'র প্রস্তাব দেবে এটা বরদাশত করতে পারেনা । এর অর্থ এ দাড়ায় যে, মুতা'র বৈধ্যতার জন্য সমাজে বারবনিতাদের মতো মেয়েদের এমন একটি নিকৃষ্ট শ্রেণী থাকতে হবে যাদের সাথে মুতা' করার অবাধ সুযোগ থাকে । অথবা মুতা' হবে শুধুমাত্র গরীবদের কন্যা ও ভগিনীদের জন্য এবং তা থেকে ফাইদা হাসিল করার অধিকারী হবে সমাজের ধনিক ও সমৃদ্ধশালী শ্রেণীর পুরুষেরা। আল্লাহ ও রসূলের শরীয়াত থেকে কি এ ধরনের বৈষম্যপূর্ন ও ইনসাফবিহীন আইনের আশা করা যেতে পারে? আবার আল্লাহ ও তার রসূল থেকে কি এটাও আশা করা যেতে পারে যে, তিনি এমন কোন কাজকে মুবাহ করে দেবেন যাকে যে কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে নিজের জন্য অমর্যাদাকর এবং বেহায়াপনা মনে করে?

Verse 8:

(وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ)

নিজেদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে (And they who are to their trusts and their promises attentive)

তাফহীম:

আমানত শব্দটি বিশ্ব-জাহানের প্রভু অথবা সমাজ কিংবা ব্যক্তি যে আমানত কাউকে সোপর্দ করেছেন তা সবগুলোর অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর এমন যাবতীয় চুক্তি প্রতিশ্রুতি ও অংগীকারের অন্তরভুক্ত হয় যা মানুষ ও আল্লাহর মধ্যে অথবা মানুষ ও মানুষের মধ্যে কিংবা জাতি ও জাতির মধ্যে সম্পাদিত হয়েছে। মু'মিনের বৈশিষ্ট হচ্ছে, সে কখনো আমানতের খেয়ানত করে না এবং কখনো নিজের চুক্তি ও অগীকার ভংগ করে না । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রায়ই তার ভাষণে বলতেন:

যার মধ্যে আমানতদারীর গুন নেই তার মধ্যে ঈমান নেই এবং যার মধ্যে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার গুন নেই তার মধ্যে দীনদারী নেই। (বাইহাকী, ঈমানের শাখা-প্রশাখাসমূহ)

রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : চারটি অভ্যাস যার মধ্যে পাওয়া যায় সে নিখাদ মুনাফিক এবং যার মধ্যে এর কোন একটি পাওয়া যায় সে তা ত্যাগ না করা পর্যন্ত তার মধ্যে তা মুনাফিকীর একটি অভ্যাস হিসেবেই থাকে। সে চারটি অভ্যাস হচ্ছে, কোন আমানত তাকে সোপর্দ করা হলে সে তার খেয়ানত করে, কখনো কথা বললে মিথ্যা কথা বলে, প্রতিশ্রুতি দিলে ভংগ করে এবং যখনই কারোর সাথে ঝগড়া করে তখনই(নৈতিকতা ও সততার) সমস্ত সীমা লংঘন করে। (বুখারী ও মুসলিম)

ইবনে কাসীর:

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ

আর যাহারা তাহাদের আমানতসমুহ ও অঙ্গীকার সমূহের হিফাযত করে। অর্থাৎ যখন তাহাদের নিকট গচ্ছিত রাখা হয় তাহারা খিয়ানত করেনা বরং গচ্ছিত কারীর নিকট উহা ফিরাইয়া দেয়। অনুরূপভাবে যখন তাহারা অঙ্গীকার করে কিংবা চুক্তিবদ্ধ হয়, তাহারা উহা পূর্ণ করে। তাহারা ঐ সকল মুনাফিকদের মত আচারণ করে না যাহাদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اية المنافق ثلاثة اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اوتمن خان

মুনাফিকের তিনটি আলামত, যখন সে কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন অঙ্গীকার করে ভঙ্গ করে আর তাহার নিকট আমানত রাখা হইলে সে উহার খিয়ানত করে।

ফী যিলালিল কোরআন:

৫। মোমেনদের পঞ্চম গুণ সম্পর্কে বলা হচ্ছে,

'যারা তাদের আমানত ও ওয়াদাসমূহকে রক্ষা করে'

অর্থাৎ ব্যক্তিগতভাবে ও দলীয় পর্যায়ে তাদেরকে যেসব আমানত দেয়া হয় তার হক তারা আদায় করে এবং কোনো মুসলিম ব্যক্তি বা দল যদি কারো সাথে কিছু ওয়াদা করে তাহলে সে ওয়াদা তারা পূরণ করে।

ব্যক্তিগতভাবে পরিশোধযোগ্য যেমন বহু আমানত আছে, তেমনি দলীয়ভাবেও অনেক আমানতের হক আদায় করতে হয়। এর মধ্যে প্রথম হচ্ছে মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি, মেযাজ ও চরিত্রের আমানত। প্রত্যেক মানুষকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পৃথক মেযাজ রুচি, চাহিদা ঝোঁক প্রবণতা ও বিশেষ বিশেষ কিছু ক্ষমতা দিয়েছেন যেগুলোকে তারা আল্লাহর নিয়ম ও ইচ্ছাতেই হাসিল করেছে। চিন্তা করলে সৃষ্টির এসব স্বাভাবিক নিয়মের মধ্য দিয়ে আল্লাহর অস্তিত্বের সাক্ষ্য পাওয়া যায়, এসব কিছুর মধ্য দিয়ে একথার প্রমাণ পাওয়া যায় যে তিনিই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা এবং সকল ক্ষমতা এককভাবে একমাত্র তাঁরই। আন্তরিকভাবে মানুষ একথা বুঝে যে, সারাবিশ্বের সর্বত্র একটিমাত্র নিয়ম চালু আছে, যার অধীনে সব কিছু নড়াচড়া করছে, বেঁচে আছে এবং সেই একই নিয়মে তাদের জীবনাবসান হচ্ছে, মহান সেই আল্লাহর ইচ্ছাই সর্বত্র কার্যকর রয়েছে, সকল নিয়মের নিয়ামক একমাত্র তিনি। প্রকৃতির বুকে বিরাজমান সারা বিশ্ব প্রকৃতির সবকিছু এ নিয়মের অধীনে চলছে, তারা এসব নিয়ম-বিধান মানতে বাধ্য; মানুষকে আল্লাহ তায়ালা কিছু স্বাধীনতা দিয়েছেন। এ স্বাধীনতা হচ্ছে তার ইচ্ছা শক্তি পরিচালনার করার, কিন্তু তার শরীরের অংগ প্রত্যংগে, তার চাহিদা এবং তার স্বভাব প্রকৃতিতে আল্লাহ তায়ালা দিয়েছেন কিছু প্রয়োজন, এসব কিছুকে পরিচালনা করার জন্যে তিনি কিছু নিয়মও দিয়েছেন। এসব নিয়ম অনুযায়ী চললে মানুষেরই কল্যাণ হবে– এ বুঝ শক্তিও তিনি তাকে দিয়েছেন, এটাই হচ্ছে তার জন্যে আল্লাহর দেয়া সব থেকে বড় নেয়ামত ও আমানত, বিশেষ করে মোমেনদের জন্যে এটাই বড় আমানত। তারা প্রকৃতির চাহিদাকে অস্বীকার করবে না, পরিত্যাগ করবে না, এ চাহিদা পূরণের জন্যে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের দেয়া বিধান রূপ আমানতের হক তারা আদায় করবে এবং তাঁর হুকুম মতোই তাদের সকল প্রাকৃতিক চাহিদা মেটাবে।

প্রকৃতির সব কিছুর মতোই মানুষের সাথে আল্লাহর প্রথম চুক্তি সংঘটিত হয়েছিলো। এ হচ্ছে সেই চুক্তি যা সৃষ্টির সূচনাতে সর্বপ্রথম মানুষ আল্লাহর সাথে করেছিলো। এ চুক্তির শর্ত ছিলো মানুষ একমাত্র আল্লাহকেই রব বলে মানবে ও জীবনের সকল ক্ষেত্রে সর্বদা তাঁরই আনুগত্য করবে। এই প্রথম চুক্তির ওপরেই গড়ে উঠেছে পরবর্তী কালের সম্পাদিত সকল চুক্তি। অতপর মোমেন কারো সাথে যে কোনো চুক্তি বা ওয়াদা করে আল্লাহকে সাক্ষী রেখেই তা করে এবং আল্লাহর ভয়েই সে চুক্তি বা ওয়াদা তারা পূরণ করে।

মুসলিম জামায়াত সকল প্রকার আমানত রক্ষা করবে বলে দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। তারা আমানত রক্ষা করছে কিনা বা ওয়াদা পূরণ করছে কিনা সে বিষয়ে তারা আল্লাহর কাছে জওয়াবদিহি করার খেয়াল রাখে এবং তাঁর কাছেই নিজেদেরকে দায়ী মনে করে। এই মূলনীতির ভিত্তিতেই পর্যায়ক্রমে মোমেনের জীবনের সব কিছু পরিচালিত হয়। আল কোরআন সংক্ষেপে মানুষকে সকল প্রকার চুক্তি রক্ষা ও ওয়াদা পূরণের জন্যে নির্দেশ দিয়েছে এবং খাস করে মোমেনদের সম্পর্কে জানিয়েছে যে তারা সকল প্রকার ওয়াদা ও আমানতের মর্যাদা রক্ষা করে। মোমেনের জীবনে ওয়াদা পূরণের এ গুণটি হচ্ছে একটি স্থায়ী গুণ। এ ওয়াদা পূরণের জন্যে তারা সকল সময়ে সজাগ ও বদ্ধপরিকর থাকে। ওয়াদা পূরণ ও পারস্পরিক চুক্তি রক্ষায় দৃঢ় না থাকলে কোনো দলীয় জীবন মযবুত হতে পারে না। এগুণটির অভাবেই দলীয় সংহতি বিপর্যস্ত হয়, দলের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস সৃষ্টি হয়। কেউ কারো ওপর নির্ভর করতে পারে না এবং সংকট সমস্যায় সদিচ্ছা থাকা সত্তেও একে অপরকে সাহায্য করতে ব্যর্থ হয়। মানুষ সামাজিক জীব বিধায় নানা সংকট সমস্যায় পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতার মুখাপেক্ষী হয়, কিন্তু এই মৌলিক গুণটির অভাবে তাদের পারস্পরিক আস্থা ও সৌহার্দ্য সম্প্রীতি বিনষ্ট হয়।

Verse 9:

(وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ)

এবং নিজেদের নামাযগুলো রক্ষণাবেক্ষণ করে (and those who are ˹properly˺ observant of their prayers.)

তাফহীম:

ওপরের খুশূ'র আলোচনায় নামায শব্দ এক বচনে বলা হয়েছিল আর এখানে বহুবচনে নামাযগুলো বলা হয়েছে। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এই যে, সেখানে লক্ষ ছিল মূল নামায আর এখানে পৃথক পৃথকভাবে প্রতিটি ওয়াক্তের নামায সম্পর্কে বক্তব্য দেয়া হয়েছে। নামাযগুলোর সংরক্ষণ-এর অর্থ হচ্ছে : সে নামাযের সময়, নামাযের নিয়ম-কানুন, আরকান ও আহকাম মোটকথা নামাযের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকটি জিনিসের প্রতি পুরোপুরি নজর রাখে । শরীর ও পোশাক পরিচ্ছদ পাক রাখে । অযু ঠিক মতো করে। কখনো যেন বিনা অযুতে নামায না পড়া হয় এদিকে খেয়াল রাখে । সঠিক সময়ে নামায পড়ার চিন্তা করে। সময় পার করে দিয়ে নামায পড়ে না । নামাযের সমস্ত আরকান পুরোপুরি ঠান্ডা মাথায় পূর্ন একাগ্রতা ও মানসিক প্রশান্তি সহকারে আদায় করে। একটি বোঝার মতো তাড়াতাড়ি নামিয়ে দিয়ে সরে পড়ে না । যা কিছু নামাযের মধ্যে পড়ে এমনভাবে পড়ে যাতে মনে হয় বান্দা তার প্রভু আল্লাহর কাছে কিছু নিবেদন করছে, এমনভাবে পড়ে না যাতে মনে হয় একটি গৎবাধা বাক্য আউড়ে শুধুমাত্র বাতাসে কিছু বক্তব্য ফুকে দেয়াই তার উদ্দেশ্য।

ইবনে কাসীর:

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلٰوتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ

যাহারা নিয়মিতভাবে সময়মত সালাত আদায় করে। হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) ও অনুরূপ তাফসীর করিয়াছে। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে জিজ্ঞাসা করিলাম, কোন আমল আল্লাহ্র নিকট অধিক প্রিয়? তিনি বলিলেন ঃ الصلواة على وقتها সময়মত সালাত আদায় করা। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহার পর কোনটি? তিনি বলিলেন ঃ بر الوالدين মাতাপিতার সহিত সদ্ব্যবহার করা। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তাহার পর কোনটি? তিনি বলিলেন ঃ والجهاد فى سبيل الله আল্লাহ্র রাহে জিহাদ করা। হাদীসটি বুখরী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে। মুস্তাদরাকে হাদীস গ্রন্থে الصلٰوة فى اُول وقتها সালাতের প্রথম ওয়াক্তে সালাত পড়া এর উল্লেখ রহিয়াছে।

হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) ও মাসরূক (র) وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلٰوتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ এর তাফসীর করিয়াছেন, "যাহারা সালাতের ওয়াক্ত সমূহের পাবন্দী করে"। আবূ যুহা, আলকামাহ ইব্ন কায়িস, সাঈদ ইব্ন জুবাইর ও ইকরিমাহ (র) অনুরূপ তাফসীর করিয়াছেন। কাতাদাহ (র) বলেন , যাহারা সালাতের ওয়াক্ত সমূহের পাবন্দী করে এবং উহার রুকু' ও সিজদাহ সঠিকভাবে আদায় করে।

আল্লাহ্ তা'আলা উল্লেখিত উত্তম গুণাবলীকে সালাত দ্বারা শুরু করিয়াছেন এবং সালাত দ্বারা উহার আলোচনা শেষ করিয়াছেন। ইহা দ্বারা সালতে যে সর্বোত্তম কাজ প্রমাণিত হয়, যেমন রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

استقيموا ولن تحصوا واعلموا ان خير اعمالكم الصلوة ولا يحفظ على الوضوء الا مؤمن

তোমরা সরল সঠিক পথ ধরিয়া চল, কিন্তু তোমরা সম্পর্ণরূপে পূঙ্খানুপূঙ্খভাবে সরল পথে চলিতে পারিবেনা জানিয়া রাখ, তোমাদের সর্বোত্তম আমল হইল সালাত। আর কেবল ঈমানদার ব্যক্তিই ওযূ অবস্থায় সর্বদা থাকে।

৬। এরপর সাফল্যমন্ডিত মোমেনদের ৬ষ্ঠ গুণ সম্পর্কে জানানো হচ্ছে যে,
'তারা তাদের সকল নামাযের হেফাযতকারী হয়।'

তারা কখনো অলসতাবশত বা হেলায় ও খেলায় নামায পরিত্যাগ করে না– যেভাবে তাদেরকে নামায কায়েম করতে বলা হয়েছে সেই ভাবেই তারা নামায কায়েম করে। তারা কখনো পরিবার ও প্রতিবেশীদের মধ্যে নামায ও নামাযের পরিবেশ গড়ে তোলার ব্যাপারে পিছপা হয় না। তারা নিয়মিতভাবে নামাযের ফরয ও সুন্নাতসমূহ আদায় করে এবং সময় মতোই প্রত্যেক নামায আদায় করে– সঠিকভাবে তারা নামাযের সকল আহকাম ও আরকান আদায় করে এবং মন-প্রাণ ও অন্তরের আগ্রহ সহকারে তারা নামায আদায় করে, আদায় করে উচ্ছসিত হৃদয়াবেগ সহকারে। প্রকৃতপক্ষে নামাযই হচ্ছে বান্দা ও তার মনিবের মাঝে সব থেকে বড় ও মযবুত সেতুবন্ধ বা যোগাযোগ রক্ষাকারী কাজ। নামাযই মোমেন অন্তরের বিশ্বাসের প্রথম ও বাস্তব প্রমাণ এবং নামাযই ঈমানের প্রথম বহিপ্রকাশ। জামায়াতবদ্ধ নামায জানায় যে সে মুসলিম জামায়াতের একজন নিয়মিত সদস্য, নামাযই মুসলিম জীবনে শৃংখলা সময়ানুবর্তিতা, নিয়মানুবর্তিতা, পরিচ্ছন্নতা, পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সহযোগিতার মনোভাব আনে। সুতরাং, যারা নামাযের হেফাযত করে না, তারা মানুষে মানুষে সম্পর্ক সৃষ্টির কোনো ধার ধারে না, তারা অন্তর প্রাণ দিয়ে নামাযের তাৎপর্য সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় না। নামাযের গুরুত্ব যে কতো বেশী তা বুঝাতে গিয়ে স্বয়ং আল্লাহ রব্বুল আলামীন সাফল্যমন্ডিত মোমেনদের গুণাবলী বর্ণনায় শুরু করেছেন নামাযের গুণ দ্বারা এবং শেষ করেছেন এর হেফাযত-এর কথায় যাতে করে একথা বুঝানো যায় যে, ঈমানের বুনিয়াদ গড়ে তোলায় নামাযের ভূমিকা কতো বড়ো এবং আনুগত্য প্রকাশ ও আল্লাহর দিকে একাগ্রতা প্রদর্শনে এই এবাদাতের অবদান কতো বেশী।

Verse 10:

(أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ

তারাই এমন ধরনের উত্তরাধিকারী যারা নিজেদের উত্তরাধিকার হিসেবে ফিরদাউস লাভ করবে (Those are the inheritors)

তাফহীম:

ফিরদৌস জান্নাতের সবচেয়ে বেশী পরিচিত প্রতিশব্দ। মানব জাতির প্রায় সমস্ত ভাষায়ই এ শব্দটি পাওয়া যায়। সংস্কৃতে বলা হয় পরদেষা, প্রাচীন কুলদানী ভাষায় পরদেসা, প্রাচীন ইরানী (যিন্দা) ভাষায় পিরীদাইজা,হিব্রু ভাষায় পারদেস, আর্মেনীয় ভাষায় পারদেজ , সুরিয়ানী ভাষায় ফারদেসো, গ্রীক ভাষায় পারাডাইসোস , ল্যাটিন ভাষায় প্যারাডাইস এবং আরবী ভাষায় ফিরদৌস। এ শব্দটি এসব ভাষায় এমন একটি বাগানের জন্য বলা হয়ে থাকে যার চারদিকে পাচিল দেয়া থাকে, বাগানটি বিস্তৃত হয় , মানুষের আবাসগৃহের সাথে সংযুক্ত হয় এবং সেখানে সব ধরনের ফল বিশেষ করে আংগুর পাওয়া যায় ।বরং কোন ভাষায় এর অর্থের মধ্যে একথাও বুঝা যায় যে , এখানে বাছাই করা গৃহপালিত পশু-পাখিও পাওয়া যায়। কুরআনের পূর্বে আরবদের জাহেলী যুগের ভাষায় ও ফিরদৌস শব্দের ব্যবহার ছিল। কুরআনে বিভিন্ন বাগানের সমষ্টিকে ফিরদৌস বলা হয়েছে। যেমন সূরা কাহফে বলা হয়েছে: ---------- তাদের আপ্যায়নের জন্য ফিরদৌসের বাগানগুলো আছে। এ থেকে মনের মধ্যে যে ধারণা জন্মে তা হচ্ছে এই যে, ফিরদৌস একটি বড় জায়গা, যেখানে অসংখ্য বাগ- বাগিচা – উদ্যান রয়েছে।

মু'মিনেদর ফিরেদৌসের অধিকারী হবার বিষয়টির ওপর সূরা ত্বা-হা (৮৩ টীকা) ও সূরা আল আম্বিয়া (৯৯ টীকা) যথেষ্ট আলোকপাত করা হয়েছে।

ইবনে কাসীর:

أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ .

ঐসকল লোকই উত্তরধিকারী, যাহারা ফিরদাউস নামক বেহেশতের অধিকারী হইবে এবং তথায় তাহারা চিরকাল অবস্থান করিবে।

বুখারী ও মুসলিম গ্রন্থদ্বয় বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

إذا سالتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فانه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر انهار الجنة وفوقه عرش الرحمن .

তোমরা যখন আল্লাহ্র বেহেশত চাহিবে তখন ফিরদাউস নামক বেহেশত চাহিবে। ঐ বেহেশতই সর্বোত্তম ও সর্বোচ্চ বেহেশত। ঐ বেহেশত হইতেই বেহেশতে প্রবাহমান নহরসমূহ প্রবাহিত হইয়াছে। এবং উহার উপরেই পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'আলা আরশ অবস্থিত।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আহমাদ ইব্ন সিনান (র) ... ... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ তোমাদের প্রত্যেকেরই দুইটি বাসস্থান আছে, একটি বেহেশতে অপরটি দোযখে। তাহার মৃত্যুর পরে যদি সে দোযখে প্রবেশ করে তবে কোন বেহেশতবাসী উহার বাসস্থানের অধিকারী হইবে। এই বিষয়টি আল্লাহ্ তা'আলা أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ দ্বারা উল্লেখ করিয়াছেন।

ইব্ন জুরাইজ, (র) লাইস (র)-এর সূত্রে মুজাহিদ (র) হইতে اُولٰٓئِكَ هُمُ الْوٰرِثُوْنَ। এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, প্রত্যেক বান্দার জন্য দুইটি বাসস্থান রহিয়াছে, একটি বেহেশতে, অপরটি দোযখে, মু'মিন ব্যক্তি যে বেহেশতে প্রবেশ করিবে সে তো তাহার বেহেশতের বাসস্থানে অবস্থান করিবে এবং দোযখের বাসস্থানটিকে বিলুপ্ত করিয়া ফেলা হইবে। আর কাফির ব্যক্তি যখন দোযখে প্রবেশ করিবে তাহার বেহেশতের বাসস্থানটি বিলুপ্ত করা হইবে এবং দোযখের বাসস্থানে সে অবস্থান করিবে। সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) হইতেও অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে। মু'মিনগণ কাফিরদের বেহেশতের বাসস্থান সমূহের মালিক হইবে। কারণ, তাহাদিগকে শুধু আল্লাহ্র ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে। তাহারা যখন তাহাদের প্রতি ওয়াজিব ইবাদত সমূহই পালন করিয়াছে এবং নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ পালন করিয়াছে আর ঐ সকল কাফিররা সেই সকল হুকুম সমূহ বর্জন করিয়াছে যাহার জন্য তাহাদিগকে সৃষ্টি করা হইয়াছিল। অতএব তাহারা আল্লাহ্র আনুগত্য স্বীকার করিলে যেই সকল নিয়ামতের অধিকারী হইত। ফলে, মু'মিনগণ সেই সকল নিয়ামতের অধিকারী হইবে। সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আবূ দারদা (রা) হইতে তিনি তাঁহার পিতা হযরত আবূ মূসা (আ)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে বর্ণিত ঃ

يجئ ناس يوم القيامة بذنوب امثال الجبال فيغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى

কিয়ামত দিবসে এমন কিছু লোক আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিত হইবে যাহারা পর্বত সমতুল্য গুনাহ বহন করিয়া আসিবে। কিন্তু আল্লাহ্ তাহাদের সকল গুনাহ ক্ষমা করিয়া দিবেন এবং ইয়াহূদী ও নাসারাদের উপর ঐ সকল গুনাহর বোঝা রাখিয়া দিবেন।

অপর এক বর্ণনায় রহিয়াছে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اذا كان يوم القيامة دفع الله لكل مسلم يهوديا او نصرنيا فيقال هذا فكاكك من النار

কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক মুসলমনের নিকট এক একজন ইয়াহূদী অথবা নাসারা প্রেরণ করিবেন। অতঃপর বলা হইবে, ইহার বদলেই দোযখ হইতে তোমার মুক্তি হইবে। এই কথা শ্রবণ করিবার পর হযরত উমর ইব্ন আবদুল আযীয হযরত আবূ বুরদাহ (রা) হইতে এই মর্মে তিনবার শপথ চাহিলেন যে, সেই আল্লাহ্র কসম, যিনি আর কোন উপাস্য নাই, অবশ্যই তাঁহার পিতা রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর আবূ বুরদাহ (রা) তাঁহার জন্য শপথ করিলেন।

আল্লামা ইব্ন কাছীর (র) বলেন, নিম্নের আয়াতগুলি ও আলোচ্য আয়াতের অনুরূপ।

تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِيْ يُوْرِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا

আমার ঐ সকল বান্দাকেই আমি ঐ বেহেশতের উত্তরাধিকারী করিব যে পরহেযগার ও আল্লাহ্ ভীরু হইবে। (সূরা মারইয়াম ঃ ৬৩) ইরশাদ হইয়াছে ঃ

تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِيْ أُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ .

ইহা হইল সেই বেহেশত, যাহা তোমাদের আমলের বিনিময়ে তোমাদিগকে উহার উত্তরাধিকারী করা হইয়াছে। (সূরা যুখ্রুফ ঃ ৭২)

মুজাহিদ ও সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) বলেন, রুমী ভাষায় 'ফিরদাউস' বাগানকে বলা হয়। পূর্ববতী কোন কোন মনীষী বলেন, যখন কোন বাগানে আঙ্গুর থাকে কেবল উহাকেই 'ফিরদাউস' বলা হয়।

Verse 11:

(الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ)

এবং সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। (Paradise as their own.1 They will be there forever.)

তাফহীম:

এ আয়াতগুলেতে চারটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু বর্ণনা করা হয়েছে:

এক: যারাই কুরআন ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা মেনে নিয়ে এ গুণাবলী নিজেদের মধ্যে সৃষ্টি করবে এবং এ নীতির অনুসারী হবে তারা যে কোন দেশ, জাতি ও গোত্রের হোক না কেন অবশ্যই তারা দুনিয়ায় ও আখেরাতে সফলকাম হবে।

দুই: সফলতা নিছক ঈমানের ঘোষণা, অথবা নিছক সৎচরিত্র ও সৎকাজের ফল নয়। বরং উভয়ের সম্মিলনের ফল। মানুষ যখন আল্লাহর পাঠানো পথনির্দেশ মেনে চলে এবং তারপর সে অনুযায়ী নিজের মধ্যে উন্নত নৈতিকতা ও সৎকর্মশীলতা সৃষ্টি করে তখন সে সফলতা লাভ করে।

তিন: নিছক পার্থিব ও বৈষয়িক প্রাচুর্য ও সম্পদশালিতা এবং সীমিত সাফল্যের নাম সফলতা নয়। বরং তা একটি ব্যাপকতর কল্যাণকর অবস্থার নাম। দুনিয়ার ও আখেরাতে স্থায়ী সাফল্য ও পরিতৃপ্তিকেই এ নাএম অভিহিত করা হয়। এটি ঈমান ও সৎকর্ম ছড়া অর্জিত হয় না। পথভ্রষ্টদের সাময়িক সমৃদ্ধি ও সাফল্য এবং সৎ মুমিনদের সাময়িক বিপদ আপদকে এ নীতির সাথে সাংঘর্ষিক গণ্য করা যেতে পারে না।

চার: মু'মিনদের এ গুণাবলীকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মিশনের সত্যতার প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হয়েছে। আবার এ বিষয়বস্তুটিই সামনের দিকের ভাষণের সাথে এ আয়তাগুলোর সম্পর্ক কায়েম করে। তৃতীয় রুকূ'র শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ ভাষণটির যুক্তির ধারা যেভাবে পেশ করা হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, শুরুতে আছে অভিজ্ঞতা প্রসূত যুক্তি। অর্থাৎ এ নবীর শিক্ষা তোমাদেরই সমাজের ব্যক্তিবর্গের মধ্যে এ বিশেষ ধরনের জীবন, চরিত্র, কর্মকাণ্ড, নৈতিকতা ও গুনাবলী সৃষ্টি করে দেখিয়ে দিয়েছে। এখন তোমরা নিজেরাই ভেবে দেখো, এ শিক্ষা সত্য না হলে এ ধরণের কল্যাণময় ফল কিভাবে সৃষ্টি করতে পারতো? এরপর হচ্ছে প্রত্যক্ষ দর্শনলব্ধ যুক্তি। অর্থাৎ মানুষের নিজের সত্তায় ও চারপাশের বিশ্বে যে নিদর্শনাবলী পরিদৃষ্ট হচ্ছে তা সবই তাওহীদ ও আখেরাতের এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রদত্ত শিক্ষার সত্যতার সাক্ষ দিচ্ছে। তারপর আসে ঐতিহাসিক যুক্তিগুলোতে বলা হয়েছে, নবী ও তাঁর দাওয়াত অস্বীকারকারীদের সংঘাত আজ নতুন নয় বরং একই কারণে অতি প্রাচীনকাল থেকে তা চলে আসছে। এ সংঘাতের প্রতিটি যুগে একই ফলাফলের প্রকাশ ঘটেছে। এ থেকে পরিষ্কার জানা যায়, উভয় দলের মধ্যে থেকে কে সত্য পথে ছিল এবং কে ছিল মিথ্যার পথে।

ফী যিলালিল কোরআন:

ওপরে বর্ণিত ছয়টি গুণ মোমেনদের সাফল্যের গ্যারান্টি হিসাবে আলোচ্য সূরাটি জানিয়েছে, বলেছে যাদের মধ্যে এ ছয়টি গুণ থাকবে তারা অবশ্যই সাফল্যমন্ডিত হবে। এ গুণগুলো মোমেন দল ও সমাজের অন্যান্য ব্যক্তিদের মধ্যে সমভাবে ক্রিয়াশীল ও প্রভাব সৃষ্টিকারী হবে। যেসব মানুষের মধ্যে উক্ত গুণাবলী গড়ে উঠবে তারা যেখানেই থাকুক না কেন এবং যে জনপদেই বসবাস করুক না কেন অন্যদের ওপর তাদের প্রভাব পড়বেই এবং তারা মর্যাদাবান মানুষ বলে বিবেচিত হবে, তারা বিবেচিত হবে আল্লাহর কৃপাধন্য মানুষ হিসাবে। প্রকৃতপক্ষে এসব গুণাবলীর অধিকারী মানুষদেরকে আল্লাহ তায়ালা পূর্ণত্ব দান করতে চেয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা চান না, তাঁর প্রিয়তম সৃষ্টি আশরাফুল মাখলূকাত জীব জানোয়ারের মত জীবন যাপন করুক, পশুরা যেভাবে আহার বিহার করে তারাও সেইভাবে আহার বিহার করুক এটাও আল্লাহ তায়ালা চান না।

যখন পৃথিবীতে গোটা মানব জাতির সবাই পশুত্বের স্তর পার হয়ে মানবতার পূর্ণ মর্যাদা লাভ করার চেষ্টা করছে তখন অন্তত যেসব মোমেনরা আল্লাহর পথে চলবে বলে অংগীকারাবদ্ধ, আল্লাহ তায়ালা চান, তারা মানবতার পূর্ণ বিকাশ সাধনে অগ্রণী ভূমিকা রাখুক, যার জন্যে তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাহলে তাদের জন্যে জান্নাতুল ফেরদাউস প্রস্তুত রয়েছে, যার ক্ষয় নেই, লয় নেই, যেখানে তারা চিরদিন থাকবে নিরাপদ নির্ভয়ে, স্থায়িত্বের নেই সীমা, নেই কোনো শেষ। এদের সম্পর্কেই এরশাদ হচ্ছে,

'তারাই হচ্ছে ফেরদাউসের উত্তরাধিকারী, তারা সেখানে চিরদিন থাকবে।'

সকল সাফল্যের শেষ লক্ষ্যই তো এই জান্নাত লাভ এবং মোমেনদের জন্যেই আল্লাহ তায়ালা এই মনোরম বাসস্থান নির্ধারণ করে রেখে দিয়েছেন। কোনো মানুষ এর বাইরে আর কিছুই আশা করে না।

Step 7: Lesson and Conclusion: Summary/conclusion from the discussion above.

সংকলনে :

Islamic Intellects and Outreach Society
Email: intellects.society@gmail.com
Website: www.intellectssociety.org